যাঁদের দেখেছি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ — বৈশাখ ১৩৫৮

তিন টাকা

প্রচ্ছদপট—পি, দেব, প্রকাশক—জানকিনাথ সিংহ রায়, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ ; মুদ্রণ—রণজিৎকুমার দত্ত, নবশক্তি প্রেস, ১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বন্ধুবর
শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর
সুবিমল করকমলে

আমার কথা

একটা জিনিষকে চারজন লোক চারদিক থেকে চার রকম ভাবে দেখতে পারে। যে কোন মানুষও এক-একজন লোকের কাছে এক-একরকম ভাবে ধরা দেন। এই কেতাবে যাঁদের কথা বলা হয়েছে, আমি তাঁদের যে ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি, সেই ভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছি এবং কোথাও অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিই নি। অন্য কোন লেখক হয়তো তাঁদের ভিন্ন ভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মাত্র। পাঠকরা অনুগ্রহ ক'রে এই কথা মনে রাখলে বাধিত হব।

বহুকাল আগেকার কথাও কেবল স্মৃতির উপরে নির্ভর ক'রে লেখা হয়েছে, সুতরাং কোন কোন জায়গায় স্মৃতিবিচ্যুতির ফলে অল্পস্বল্প ভুলভ্রান্তি যে হয় নি, এমন দাবি করতে চাই না।

একখানি মাত্র পুস্তকে আরো অনেকেরই কথা বলা সম্ভবপর হ'ল না। এখানি হচ্ছে আর একখানি পুস্তকের অগ্রদূত। প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হ'ল শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে। দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হবে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন ক'রে। অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা,
২৩০/১, আপার চিৎপুর রোড
বাগবাজার—৩

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সূচীপত্র

সূত্রপাত

উনবিংশ শতাব্দী হচ্ছে বাংলার পক্ষে এক অসাধারণ শতাব্দী। ঐ শতাব্দীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব মহতী প্রতিভা বিকশিত হয়ে সমগ্র ভারতে অতুলনীয় আদর্শ সৃষ্টি করেছিল তার জন্যে বাঙালী চিরদিনই গর্ব-গৌরব অনুভব করতে পারবে।

সাহিত্যে মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র; চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল; অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও শিশিরকুমার; দর্শনে ব্রজেন্দ্রলাল শীল; বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু; রসায়নে প্রফুল্লচন্দ্র রায়; রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র এবং ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ; এক শতাব্দীর মধ্যে এতগুলি বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাব যে কোন দেশ বা জাতির পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে গত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ ক'রে আরো যে-সব অসামান্য ব্যক্তি নিজেদের স্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন, তাঁদের তুলনাও সমসাময়িক ভারতের অন্যান্য প্রদেশ খুঁজলে পাওয়া যাবে না। যেমন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী রায় ও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি। মুসলমান কবি নজরুল ইসলামও জন্মগ্রহণ করেছিলেন

গত শতাব্দীতেই। আরো অনেক নাম করা যায়, কিন্তু আপাততঃ নামের ফর্দ আর বাড়িয়ে কাজ নেই; কারণ পরে যথাসময়েই আমাদের চিত্রশালায় আপনারা তাঁদের ছবি দেখতে পাবেন।

ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যের মৌতাত আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছিল। যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বাইরে যখন পদচালনা করবার স্বাধীনতা অর্জন করলুম, তখন বড় বড় সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেই নিজেকে মনে করতুম সব চেয়ে ভাগ্যবান। বিশ বৎসর বয়স পার হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি থেকে আরম্ভ ক'রে তখনকার অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কাছে বার বার ধর্‌না দিয়ে এসেছি এবং তখনকার যে সব নবীন লেখক পরে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছি— যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি।

সকলকার কাছ থেকেই লাভ করতুম সাদর ব্যবহার, কিন্তু মুস্কিলে পড়েছিলুম একবার। স্বর্গীয় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের তখন বেশ নাম। প্রধান প্রধান মাসিকপত্রে তিনি লিখতেন, শিশুদের সাহিত্যেও তাঁর হাত ছিল মিষ্ট। কিন্তু আমাকে সব চেয়ে আকৃষ্ট করত তাঁর পল্লীচিত্রগুলি। বাংলার পল্লী নিয়ে তেমন কলমের ছবি আজ পর্যন্ত আর কেউ আঁকতে পারেন নি। শ্রদ্ধাপূর্ণ মন নিয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। আমার বয়স তখন

ষোলো-সতেরো বৎসর— ছোট ছোট পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা সুরু করেছি এবং সে সময়ে দীনেন্দ্রকুমার বোধ হয় সাপ্তাহিক "বসুমতী"র সম্পাদক কিংবা সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন।

দীনেন্দ্রকুমার তখন হাটখোলা অঞ্চলে একটি ছোট রাস্তায় একখানা নোংরা বাড়ীর তিনতলায় বাস করতেন। অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে একটি বন্ধ দরজায় করাঘাত করলুম। মিনিট দুই পরে দরজা খুলে গেল। দেখলুম একটি কৃশ ভদ্র-লোককে— মুখ যাঁর সৌম্য ব'লে মনে হ'ল না।

'আপনিই কি দীনেন্দ্রবাবু?'

শুষ্ক স্বরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কি দরকার আপনার?'

নমস্কার ক'রে বললুম, 'দয়া ক'রে আপনার হাতের একটু লেখা দেবেন?'

'ও সব আমি ভালোবাসি না, ও সব আমি পছন্দ করি না', ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এই বলতে বলতে তিনি রেগে দূরে গিয়ে আমার দিকে একেবারে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। আমি তো হতভম্ব! অর্ধ মিনিটকাল চুপ ক'রে অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। দীনেন্দ্রবাবু আমার দিকে আর একবারও ফিরে তাকালেন না। তখন 'নমস্কার' শব্দটি উচ্চারণ ক'রে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি স'রে প'ড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

বহু বৎসর পরে স্বর্গীয় জলধর সেন মহাশয়ের বৈঠকে ব'সে আবার যখন দীনেন্দ্রবাবুর দেখা পাই, সাহিত্য-জগতে তখন আমি আর অপরিচিত নই। জলধরবাবু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেবারে তিনি আমার প্রতি আর উপেক্ষা প্রকাশ করলেন না, কিছুক্ষণ ভালোভাবেই আলাপ করলেন। কিন্তু সেবারেও আমার মনে হয়েছিল, তাঁর হাতের লেখা সরস বটে, কিন্তু

তাঁর মুখের কথায় রসকষ কম। বলা বাহুল্য, সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কাহিনী তুলে ভদ্রলোককে আর লজ্জা দিই নি। জলধর সেনের সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, অথচ দুজনেরই প্রকৃতি ছিল রীতিমত পরস্পরবিরোধী এবং এই জন্যেই বোধ করি শেষ পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নি। দীনেন্দ্রবাবু প্রাচীন বয়সে জলধরবাবুকে "হিমালয়" রচনার গৌরব থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করতেও ছাড়েন নি।

কিন্তু আর কোন সাহিত্যিকের কাছে গিয়ে এমন রূঢ় ব্যবহার পাই নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে তো বুঝায় রবীন্দ্রনাথকেই। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অবনীন্দ্রনাথও আপন আপন বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। ওঁদের কেউ কেউ আমার বাবার বয়সী এবং কেউ কেউ আমার বাবার চেয়েও বয়সে বড়। কিন্তু সেই তরুণ বয়সেও তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমি লাভ করেছি স্নেহশীল বন্ধুর মত সুমধুর ব্যবহার।

তবে এখানে আর একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলতে পারি, যদিও তা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য নয়। সে যুগের একজন অতি-বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রথম বয়সে কবিতা লিখতেন— রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বড়ালের মত তাঁরও কাব্যগুরু ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। তারপর তিনি ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প-লেখক, বাংলা "প্রভাতী" ও লাহোরের "ট্রিবিউন" প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকরূপে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতার গ্রে স্ট্রীটে ছিল তাঁর বাড়ী। আমি তাঁর লেখার এত ভক্ত ছিলুম যে, একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলুম না। দেখা হ'ল বটে, কিন্তু ঐ মাত্র! আমি দাঁড়িয়ে রইলুম নীচের উঠানের উপরে এবং তিনি উঁকি মারলেন দোতলার

ঘরের জানলা থেকে। নমস্কারের আদান-প্রদান ও একটি কি দুটি বাক্য বিনিময় হ'ল এবং সেইখানেই সাক্ষাৎকারের পালা শেষ। আমার কাঁচা বয়স দেখে এবং নিজের প্রৌঢ়ত্ব স্মরণ ক'রেই বোধ হয় তিনি আর নীচে নেমে এলেন না। বলা উচিত, আমার বয়স তখন সতেরো-আঠারোর বেশী নয়।

কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস! তেরো-চৌদ্দ বৎসর আগে এই নগেন্দ্রনাথই আমার বাড়ীতে অনাহূত অতিথির মত এসে আমাকে করেছিলেন বিস্মিত ও পুলকিত। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা সেদিন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম। শুনে তিনি হাসতে লাগলেন।

সে যুগের সাহিত্য ও চারুকলা এমন একটি সাত্ত্বিক আবেষ্টনের মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করত, আজকাল যার বিশেষ অভাব অনুভব করি। এখন লেখকদের শক্তি যত ক'মে আসছে, বেড়ে উঠছে তত টাকার দিকে লোভ ও Pose বা ভঙ্গী ধারণের দিকে দৃষ্টি। তখন মাসিক সাহিত্যের প্রথমশ্রেণীর লেখকরাও রচনার জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সাধনা ছিল না অর্থকরী এবং তখন এক একটি সাহিত্য বৈঠকে গিয়ে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে যেমন উচ্চ শ্রেণীর সংলাপ শুনে ও পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ক'রে ফিরে আসতুম, আজকাল তেমন সুযোগ আর পাওয়া যায় না বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলাদেশে সাহিত্য ও চারু-কলায় যাঁরা ধুরন্ধর ব'লে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছেন, অতঃপর আমরা একে একে তাঁদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয়সাধন ক'রে দেব।

এক

এখনকার বুড়োরা হয়তো মনোমোহন বসুকে চিনতে পারবেন, কিন্তু এখনকার ছেলেরা বোধ হয় তাঁর পরিচয় জানেন না। এজন্যে ছেলেদের দোষ দিই না, প্রধানতঃ এজন্যে দায়ী হচ্ছেন সাহিত্যিকরা, কারণ অতীতের স্মরণীয় নামগুলিকে তাঁরা লোকের চোখের সামনে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আদর্শ এসেছে ইংলণ্ড থেকে। কিন্তু বাঙালীদের মত ইংরেজরাও সাহিত্য ও আর্টের নানা বিভাগে যাঁরা অতুলনীয় প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, কেবল তাঁদের নিয়েই সর্বদা বড় বড় কথা বলেন না, উল্লেখযোগ্য অপ্রধান কর্মীদের জন্যেও এমন খানিকটা জায়গা ক'রে রাখেন যে, তাঁদের নাম অতীতের অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজ কবি টমাস গ্রের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁর রচনার পরিমাণ যৎ-সামান্য। কিন্তু যে ইংরেজী ভাষা শেখে, সেই-ই তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হয়— এমন কি বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণ বাঙালীদের জিজ্ঞাসা করুন দেখি— 'গোবিন্দচন্দ্র রায় কে?' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর পাবেন, 'জানি না।'

মনোমোহন বসুকেও এর মধ্যেই আমরা ভুলতে বসেছি, অথচ আমাদের নাট্য-সাহিত্যে তিনি অপ্রধান ভূমিকাগ্রহণ করেন নি। যাঁরা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, সেই রাম-নারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তিনিও ছিলেন একজন প্রধান কর্মী। এদেশে সাধারণ

রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আগে "বহুবাজার বঙ্গ-রঙ্গালয়ে"র অবৈতনিক সম্প্রদায় সহরে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিল। মনোমোহন বসু ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের নাট্যকার। ওখানে তাঁর "রামাভিষেক," "সতী" ও "হরিশ্চন্দ্র" নামে তিনখানি নাটক অভিনীত হয়। "বহুবাজার বঙ্গ-রঙ্গালয়" সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বিবরণ মৎসম্পাদিত "নাচঘর" (প্রথম বর্ষ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মনোমোহনের "রামাভিষেক" নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ হচ্ছে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ। তিনি মোট আটখানি নাটকের নাট্যকার। সাধারণ রঙ্গালয়েও (গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে) তাঁর "প্রণয় পরীক্ষা" নামে একখানি নাটক অভিনীত হয় (১৮৭৪ খৃঃ)। তিনি নারী নিয়ে অভিনয়ের বিরোধী ছিলেন। তাই পরে আর সাধারণ রঙ্গালয়ের সম্পর্কে আসেন নি।

কিন্তু মনোমোহন কেবল নাট্যকারই ছিলেন না, আমাদের বাল্যকালে তাঁর "দুলীন" নামে একখানি প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার গ্রন্থ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সাময়িক সাহিত্যেও তাঁর দানের অভাব নেই। প্রথমে তিনি "বিভাকর" নামে এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তারপর তিনি "মধ্যস্থ" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, পরে তা পাক্ষিক ও সর্বশেষে মাসিক হয়ে দাঁড়ায়। "মধ্যস্থ" পাঠ করলে প্রথম যুগের বাংলা রঙ্গালয় সম্বন্ধে অনেক দামী দামী তথ্য জানতে পারা যায়। মনোমোহনের স্কুলপাঠ্য পুস্তকও ছিল। তা ছাড়া তিনি বাউল, কীর্তন ও যাত্রার গান বেঁধেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই হ'ল তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

গিরিশচন্দ্রের মত মনোমোহনও সর্বপ্রথমে নাট্যকার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন নি, নাটক রচনার জন্যে তিনিও লেখনী ধারণ

করেছিলেন নাট্যপ্রিয়দের তাগিদেই। "বহুবাজার বঙ্গ-নাট্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হবার পর সম্প্রদায়ের পরিচালকরা দেখলেন, অভিনয়ের উপযোগী নাটকের একান্ত অভাব। মনোমোহন বসু তখন 'কবি' ও 'হাফ-আখড়াই' প্রভৃতি সঙ্গীত-যুদ্ধের জন্যে অসংখ্য গান রচনা ক'রে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। "বঙ্গ-নাট্যালয়ে"র পরিচালকরা তাঁর কাছে গিয়ে ধর্না দিয়ে বললেন, 'আমাদের জন্যে আপনাকে একখানি নাটক লিখে দিতে হবে।' সেই নির্বন্ধাতিশয়ের ফলেই রচিত হয়, মনোমোহনের প্রথম নাটক "রামাভিষেক।"

উক্ত নাটকের অসামান্য সাফল্য দেখে মনোমোহন উৎসাহিত হয়ে "সতী" নাটক রচনা করলেন। এই নাট্যাভিনয় তখনকার কলকাতায় একটি স্মরণীয় ঘটনা ব'লে গণ্য হয়েছিল। তারই কিছু-কাল আগে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানকার প্রধান নাট্যকার ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। সেখানকার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন "অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, "ন্যাশনাল পেপার" সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে মনো-মোহন বসুও (তিনি তখন "মধ্যস্থ" পত্রিকার সম্পাদক)। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতাদের (গিরিশ-চন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল বসু প্রভৃতি) সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রেও "বঙ্গ-নাট্যালয়ে"র "সতী" এমন আসর জমিয়ে তুলেছিল যে, সাগ্রহে অভিনয় দেখতে আসতেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট), কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রমাধব ঘোষ (হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি) ও কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মত স্বনামধন্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ।

অনেক দিন আগেকার কথা। আমি তখন "ভারতী" পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, '"ভারতী"তে আমি বঙ্কিম-যুগের বাঙালীদের নিয়ে আলোচনা করতে পারি কি?'

সম্মতি দিয়ে সম্পাদিকা বললেন, 'এ খুব ভালো প্রস্তাব। তুমি লেখা সুরু কর। কিন্তু হেমেন্দ্র, বয়স তোমার কাঁচা, তুমি যদি নিজের নামে পুরানো কথা লেখো, লোকের শ্রদ্ধা হবে না। তোমাকে নাম ভাঁড়িয়ে লিখতে হবে। সকলে ভাববে কোন সেকেলে লোকের লেখা।'

তাই হ'ল। প্রসাদদাস রায়ের লেখা "বঙ্কিম-যুগের কথা" "ভারতী"তে ধারাবাহিক ভাবে মাসে মাসে বেরুতে লাগল। (তারপর ঐ নামে আমি অনেক পত্রিকায় অনেক লেখা লিখেছি এবং এখনো লিখছি। আসলে এটিই হচ্ছে আমার পিতৃপ্রদত্ত নাম এবং 'হেমেন্দ্রকুমার রায়' হচ্ছে ছদ্ম নাম। স্বর্ণকুমারী দেবীর পরামর্শে আমার আসল নামটিকেই আমি ব্যবহার করেছিলুম ছদ্ম নামের মত!)। সেই উপলক্ষে বঙ্কিম-যুগ সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যে আমাকে তখনকার বহু প্রাচীন ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়ে বেড়াতে হয়েছিল।

একদিন দুপুরে উত্তর-পূর্ব কলকাতার একটি রাস্তায় (নাম মনে পড়ছে না) মনোমোহন বসুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। বাড়ীর সদর দরজা খোলা ছিল। প্রবেশপথের দুই দিকে দুইটি রোয়াক। একটি রোয়াকের উপরে বসেছিলেন একজন বৃদ্ধ। না-রোগা, না-মোটা দেহ। শ্যামবর্ণ।

সুধোলুম, 'মনোমোহন বাবু আছেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'আমি। কি দরকার?'

আমার উদ্দেশ্য জানালুম। একটু হেসে অঙ্গুলি সঙ্কেতে সামনের রোয়াক দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসুন।'

উপবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি নাটক লেখা বন্ধ করলেন কেন?'

—'সুরুচির খাতিরে। যেখানে পতিতা নিয়ে অভিনয় হয়, সেখানে আমি নেই। কেবল আমি কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তো প্রথমে পাবলিক থিয়েটারের সম্পর্কে এসেছিলেন, আর এজন্যে তাঁর উৎসাহও বড় কম ছিল না, কিন্তু থিয়েটারে পতিতাদের আগমনের কথা শুনেই তিনি পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

—'কিন্তু আপনাদের মত একজন সাহিত্যিকের প্রস্তাবেই তো রঙ্গালয়ে নারী নিয়ে অভিনয়ের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।'

—'মাইকেলের কথা বলছেন? মাইকেল ছিলেন ভিন্ন রুচির লোক, সেই অনুসারেই তিনি এই কুপ্রস্তাব করেছিলেন। মধুসূদন ক্রীশ্চান হয়ে 'মাইকেল' নাম ধারণ করেছিলেন, আমি গোঁড়া হিন্দু হয়ে ও-রকম নাম ধারণ করতে যাব কেন? আর, আমি তো নারী নিয়ে অভিনয়ের বিরোধী নই, আমার আপত্তি পতিতাদের জন্যে। কিন্তু হিন্দুদের কুলকন্যারা যে নটী হয়ে রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করবেন, এমন কথা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি না। সেই জন্যেই আমি নারীর পার্টে পুরুষদেরই দেখতে চাই। জানি তার ফলে অভিনয় স্বাভাবিক হয় না, কিন্তু স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে গিয়ে সমাজের সর্বনাশ করতে যাব কেন? দেখছেন তো, পতিতাদের সঙ্গে ওঠা-বসা ক'রে থিয়েটারের অভিনেতাদের কতটা চারিত্রিক অবনতি হয়েছে? নট বলতে এখন বোঝায় সমাজ-ছাড়া বাপে-খেদানো, মায়ে-তাড়ানো, মাতাল, মূর্খ লোককে।'

মনের ভিতরে কতকগুলি বিরুদ্ধ যুক্তির উদয় হ'ল। কিন্তু

ভেবে দেখলুম, আমি গিয়েছি একজন প্রাচীন ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত মতামত জানবার জন্যে, এখানে তর্কাতর্কি না করাই উচিত। অতএব একেবারেই চুপ মেরে গেলুম।

মনোমোহনবাবু বলতে লাগলেন,—'ফিরিঙ্গীদের দেখাদেখিই এদেশে পতিতা নিয়ে অভিনয়ের প্রথা এসেছে। বিলাতী নটীরাও নামেই ভদ্র, আসলে কুলটা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সব কাজেই ফিরিঙ্গীদের অনুকরণ। দেখুন না, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করব, নাম দেওয়া হ'ল "ন্যাশনাল থিয়েটার।" মাতৃ-ভাষাকে আমরা ঘৃণা করি। তাই টিকিট আর বিজ্ঞাপনেও ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা হয়। "ন্যাশনাল থিয়েটারে"র সাংবাৎসরিক উৎসবে আমাকে বক্তৃতা দিতে ডেকেছিল। বক্তৃতাতেও আমি ঐ সব কথা উল্লেখ করি। কিন্তু আমার বলা মুখব্যথা মাত্র, কে শুনবে আমার কথা, ফিরিঙ্গীয়ানা যে আমাদের অস্থি-মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করেছে! তারপর কত-কাল কেটে গিয়েছে, অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। আজও সব নাট্যশালার বিলাতী নাম, সব টিকিটের উপরে ইংরেজী অক্ষর।'

ভেবেছিলুম ভদ্রলোকের সঙ্গে আরো দু-একবার দেখা করব, কিন্তু সে সুযোগ আর পাইনি। কারণ তার অল্পদিন পরেই (১৩১৮ সালে) তিনি পরলোকগমন করেন।

বাংলা রঙ্গালয়ের নামে, বিজ্ঞাপনে, এমন কি প্রবেশপত্রের উপরেও ইংরেজী ভাষার অশোভন প্রভাব সম্বন্ধে বসু মহাশয় যে সব অভিযোগ করেছিলেন তা যে অত্যন্ত সঙ্গত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এখানে দেশাত্মবোধ পরিপূর্ণ ভাবে জাগ্রত হবার পরেও বাঙালীরা কথায়, লেখায় ও বক্তৃতায় ইংরেজীর মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

সুতরাং সেই ইংরেজীয়ানার ঢেউ যে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে এসেও লাগবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিচালকরা যখন "ন্যাশনাল" ও "গ্রেট ন্যাশনাল" প্রভৃতি বিজাতীয় নামধারণের জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, তখনও বহুবাজারের রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব ছিল এবং ওখানকার কর্মকর্তারা প্রবেশপত্রে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করতেন। মনোমোহন বসুর "সতী" নাট্যাভিনয়ের প্রবেশপত্র ছিল এইরকম।

বহুবাজার বঙ্গ-নাট্যালয়

সতী নাটকাভিনয়

নং ২৫ বিশ্বনাথ মতিলালের লেন।

শনিবার মাঘ ১২৮০

অভিনয়ারম্ভ রাত্রি ৮॥ ঘণ্টার সময়।

এক টিকেটে একজন মাত্র স্ত্রীলোক।

প্রবেশদ্বারে ইহা দিতে হইবে।

কিন্তু এ সব দেখেও আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদের চোখ ফোটেনি, তাঁরা বিলাতী নাম ও বিলাতী ভাষা ব্যবহার ক'রে এসেছেন বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত। নবযুগের উদ্বোধক শিশিরকুমারই সর্বপ্রথমে রঙ্গালয়ের নাম রাখার সময়ে বাংলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। "নাট্যমন্দিরে"র প্রবেশপত্রেও বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু মনোমোহন বসু তখন পরলোকে।

দুই

বাবার একটি অনতিবৃহৎ পুস্তকাগার ছিল। ইংরেজী ও বাংলা দুইশ্রেণীর কেতাবই সাজানো থাকত আলমারিতে। সেখানে প্রায়ই অনধিকার প্রবেশ করতুম গোপনে। ইংরেজী বই প'ড়ে বুঝবার বয়স তখনো হয় নি। তাই প্রদীপ্ত আগ্রহে আক্রমণ করতুম বাংলা বইগুলিকেই। এই পুস্তকাগারের দৌলতে বালক বয়স পার হবার আগেই তখনকার বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে করেছিলুম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন।

ঐ পুস্তকাগারে ব'সেই গিরিশচন্দ্রের রচনার সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হই। কিন্তু তাঁর নাটকগুলি পড়তে আমার ভালো লাগে নি, এখনো ভালো লাগে না। এজন্য তাঁর লিখিত নাটকগুলিকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ গিরিশচন্দ্র সেগুলিকে মঞ্চের জন্যে অভিনয়ের উপযোগী ক'রে লিখেছিলেন—সংস্কৃতে ও ইংরেজীতে যাকে বলে যথাক্রমে 'দৃশ্যকাব্য' ও 'প্লে'। সেগুলির নাটকীয় ক্রিয়া, আখ্যানবস্তু, পাত্র-পাত্রী ও সংলাপ প্রভৃতি মঞ্চের উপরে এমন যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, তাদের নাটকত্ব ও নাট্যকারের প্রতিভা চিত্তকে একেবারে অভিভূত ক'রে দেয় এবং তখনই গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় বিশেষত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে থাকা যায় না।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয়োপযোগী নাটকগুলি পাঠোপযোগী হয় না ব'লে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিককেই তাঁর সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করতে দেখেছি। "প্লে"র মধ্যে তাঁরা খোঁজেন কাব্য বা সাহিত্যরস।

নিত্য-দৃষ্ট সংসারে সাধারণ মেয়ে-পুরুষরা যে-ভাবে কথাবার্তা কয়, গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মুখে ঠিক সেইরকম ভাষাই দিতে চাইতেন এবং রঙ্গালয়ের নাট্যকারের পক্ষে তাই করাই উচিত ব'লে মনে হয়। বার্নার্ড শ পর্য্যন্ত মত প্রকাশ করেছেন: অভিনয়ের নাটকের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরস হচ্ছে মারাত্মক।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল অলঙ্কৃত ভাষা ও কাব্যরসের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁদের নাটকগুলিও হয়েছে অপেক্ষাকৃত পাঠোপযোগী। কিন্তু এ কথা সকলেই জানেন এবং মানেন যে, নাট্যকার হিসেবে তাঁদের আসন গিরিশচন্দ্রের নীচে।

বালকবয়স পার হলুম, রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটকের অভিনয় দেখলুম— কেবল নাটকের নয়, তাঁর নিজেরও অভিনয়— সীতারাম, করুণাময়, করিম চাচা ও বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকায়। নাট্যসাহিত্যে এবং নটচর্যায় তাঁর সমান অসাধারণতা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর মিনার্ভা থিয়েটার ঘোষণা করলেন মাত্র এক রাত্রির জন্যে "প্রফুল্লে"র পুনরভিনয়। তারিখ ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, তবে আমি তখন তরুণ যুবক। সাগ্রহে অভিনয় দেখতে ছুটলুম। গিরিশচন্দ্র 'যোগেশ', অর্ধেন্দুশেখর 'রমেশ', দানীবাবু 'সুরেশ', স্বর্গীয় তিনকড়ি 'জ্ঞানদা', সুশীলাবালা 'প্রফুল্ল'। প্রেক্ষা-গৃহে জনতারণ্য। কষ্টেসৃষ্টে একখানি আসন সংগ্রহ করলুম। যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যে অমৃতায়মান অভিনয় করলেন তা একেবারেই বর্ণনাতীত— অদ্যাবধি তার তুলনা খুঁজে পাই নি— এদেশে তো নয়ই, অন্য কোন দেশেও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করি না।

দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের মুখেই এই উক্তি শুনেছি: 'বিলাতে জন্মালে গিরিশবাবু নিশ্চয়ই 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত হতেন। আমি

স্যর হেনরি আর্ভিংয়ের অভিনয় দেখেছি। তিনি গিরিশবাবুর চেয়ে ভালো অভিনয় করতেন না।'

দ্বিজেন্দ্রলাল আরো বলেছিলেন, 'করুণাময়ের ভূমিকায় আমি গিরিশবাবুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। যেখানে আত্মহত্যায় উদ্যত করুণাময় শূন্যে হাত বাড়িয়ে গলায় দেবার দড়ি খুঁজছে, গিরিশবাবুর সেখানকার অভিনয়ের তুলনা হয় না।'

দ্বিজেন্দ্রলাল "প্রফুল্লে" গিরিশচন্দ্রের 'যোগেশ' দেখেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু নাটকের সর্বশেষ দৃশ্যে যোগেশরূপে গিরিশ-চন্দ্রের যে মূর্তি দেখেছি, তা আজ পর্যন্ত আমার মনের ভিতর আঁকা আছে অগ্নি-রেখায়। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলবার সময়ে তাঁর চোখে অশ্রু থাকত না, কিন্তু মনে হ'ত সে দুটো পাথরে গড়া চোখ—চরম শোকে প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে! অর্ধেন্দুশেখর যোগেশের ভূমিকায় এই দৃশ্যে নিজের অক্ষমতা বুঝে, দুই হাতে চোখ ঢেকে মাটির উপরে ব'সে পড়তেন।

"প্রফুল্ল" দেখবার পর আমার আর তর সইল না। দু'একদিন পরেই অপরাহ্নকালে গিয়ে হাজির হলুম গিরিশচন্দ্রের বাগবাজারের বাসভবনে। এখানে আর একটি কথা গোপন না করাই উচিত। একেবারে নিঃস্বার্থভাবেই আমি সেদিন 'হিরো ওয়ারসিপ' বা মহাপুরুষার্চন করতে যাই নি—সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম "রাণী-দুর্গাবতী" নামে স্বলিখিত নাটকের পাণ্ডুলিপি। মনের খেয়ালে আমি তখন মাঝে মাঝে নাটক রচনার চেষ্টা করতুম। এখন বুঝেছি, সে সব নাটক হয়েছিল অমৃতলালের ভাষায় 'না-টক না-মিষ্টি'।

একটি ফর্দা জমি পেরিয়ে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলুম। শুনলুম তিনি বাহির-বাটীর দ্বিতলে বিশ্রাম করছেন। অতবড় নাট্যকার ও অতবড় অভিনেতা আমার মত অনাহূত

নাবালকের আবির্ভাব কিভাবে গ্রহণ করবেন, তাই ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলুম।

লম্বা একখানি হলঘর। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখা যায় আলমারিতে সাজানো রয়েছে সারি সারি বই। পশ্চিমদিকে কাঠের 'পার্টিশান।' তারই কাছে চাদর-পাতা তোষকের উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে আছেন গিরিশচন্দ্র ; ভাবুক, গম্ভীর মূর্তি— আদুড় গা। প্রশান্ত দৃষ্টি তুলে একবার আমার দিকে তাকালেন। নমস্কার করলুম। প্রতি-নমস্কার ক'রে ঘাড় নেড়ে আমাকে বসবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন।

মেঝেয় পাতা ছিল গালিচা কি সতরঞ্চী মনে নেই, তারই উপরে ব'সে পড়লুম।

চোখের সামনে দেখলুম যেন এক সিদ্ধ সাধকের অপূর্ব মূর্তি। তাঁর প্রথম ও মধ্য জীবনের অনেক উদ্দামতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনী শুনেছিলুম। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন : 'মদ, গাঁজা আফিং, চরস, ভাং— কোনটা বা বাকি আছে।··· ··· ···সব নেশা করে দেখেছি। বোতল বোতল মদ খেয়েছি— একদিন বাইশ বোতল বিয়ার খেয়েছি।' কিন্তু সে কোন্ গিরিশচন্দ্র জানি না, আমার সামনে তাঁকে দেখলুম না। এঁর ব্যক্তিত্বের ও গাম্ভীর্যের প্রভাবে মন অভিভূত হয়ে যায় প্রথম দর্শনেই। শ্রদ্ধা হয়, ভক্তি হয়, মাথা নত হয়।

কয়েক মিনিট কাটল। তারপর তিনি মৃদু কণ্ঠে ধীরে ধীরে শুধোলেন, 'কি দরকার বাবা ?'

—'আজ্ঞে, আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।'

—'এই জরাজীর্ণ দেহটা দেখতে এসেছেন ? এটা তো কেবল আবরণ। আসল মানুষ থাকে ভেতরে।'

—'আজ্ঞে, আপনার নাটক আর অভিনয় দেখলেই বোঝা যায় আপনার ভিতরে আছে আসল মানুষটি।'

তিনি কিছু বললেন না, তার ওষ্ঠাধরে ফুটেই মিলিয়ে গেল একটি ক্ষীণ হাসির রেখা।

অল্পক্ষণের নীরবতা। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন একটি ভদ্রলোক। বললেন, 'আমার স্ত্রীর হাতে একটি ফোড়া হয়েছে, একটা ওষুধ দিন।' (পরে শুনেছি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় গিরিশচন্দ্রের অসামান্য হাতযশ ছিল)।

গিরিশচন্দ্র বললেন, 'জলপটি লাগাও।'

ভদ্রলোক খুঁত খুঁত ক'রে বললেন, 'কোন ওষুধ দেবেন না? খালি জলপটিতে কি কাজ হবে?'

গিরিশচন্দ্র বললেন— সেই মৃদুকণ্ঠেই, 'জলপটি অত্যন্ত উপকারী। লোকে এর কদর বোঝে না। অনেক সময়ে বড় বড় ওষুধের চেয়েও জলপটিতে বেশী কাজ পাওয়া যায়। আগে জলপটি দিয়ে দেখ, তারপর দরকার হ'লে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।'

ভদ্রলোকের প্রস্থান। দুইজন যুবকের প্রবেশ। বয়সে আমার চেয়ে বেশী বড় নয়। হাতে খুব বড় একখানা খাতা— বোধ হয় পাণ্ডুলিপি।

খাতাখানার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গিরিশচন্দ্র বললেন, 'কি চাই বাবা?'

একটি যুবক বললেন, 'একখানা নাটক লিখেছি। আপনাকে শোনাতে এসেছি।'

ভাবহীন মুখে গিরিশচন্দ্র বললেন, 'খানিকটা পড় তো শুনি।'

যুবক সাগ্রহে পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে বসলেন। মিনিট দশেক শোনবার পর গিরিশচন্দ্র বললেন, 'বাবা, নাটক রচনা করবার

আগে সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়— এখনো সে বয়স তোমার হয় নি। আমি নিজে ত্রিশ বৎসর বয়সের আগে মৌলিক নাটক রচনায় হাত দিই নি।'

আরো দু'চারটি কথার পর যুবকদ্বয়ের প্রস্থান। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আরো অল্পক্ষণ বাক্যালাপ করলুম। কি কি কথা হ'ল, সব ভালো ক'রে মনে পড়ে না। বহুকাল আগের কথা, কখনো মনে পড়ে, কখনো পড়ে না।

গাত্রোত্থান ক'রে বললুম, 'আপনার কাছে উপদেশ পেতে এসেছিলুম, উপদেশ পেয়েছি।'

—'কি উপদেশ বাবা ?'

—'সংসারে অভিজ্ঞতা না জন্মালে নাটক লিখতে নেই। আমিও আপনাকে আমার নাটক শোনাতে এসেছিলুম। কিন্তু আর তা শোনাবার দরকার নেই।'

বাগবাজারের গিরিশভবনে আর একবার গিয়েছিলুম। তারপর তাঁর সঙ্গে আমার তৃতীয়বার দেখা হয় "কোহিনূর থিয়েটারে"র সামনেকার প্রাঙ্গণে। ফোয়ারার পাশের রাস্তায় তিনি পায়চারি করছিলেন। নমস্কার ক'রে সুধোলুম, 'আজ তো থিয়েটারে আপনার কোন কাজ নেই, তবু আপনি এসেছেন!'

তিনি বললেন, 'শরীর আর বয় না, তবু অধ্যক্ষ যখন হয়েছি, আসতে হয় বৈকি!'

মনে হচ্ছে, সেইদিনই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'কোন সভা-সমিতিতে কখনো আপনার দেখা পাই না কেন ?'

অতি মৃদু হেসে তিনি বলেছিলেন, 'সভা যাঁরা করেন তাঁরা আমাকে পাবার জন্যে ব্যস্ত নন। আর যেতেও আমার ইচ্ছা হয় না। উচ্চশিক্ষিতরা থিয়েটারে আমাদের অভিনয় দেখে খুশী হন

বটে, কিন্তু বাইরে মনে মনে আমাদের ঘৃণা করেন। তাই তফাতে থেকেই মান বাঁচাতে চাই।'

আজ জীবিত থাকলে গিরিশচন্দ্র দেখতে পেতেন, স্রোত বদলে গেছে। বাঙালী অভিনেতারা আজ আর ঘৃণ্য জীব নন।

অভিনয়ের ঘণ্টা বাজল। বিদায় নিয়ে আসছি, তিনি ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনো নাটক-টাটক লেখো নাকি?'

—'আজ্ঞে না, আপনার উপদেশ ভুলি নি। ত্রিশ বৎসর বয়সের আগে নাটক তো লিখবই না, পরেও কখনো লিখব কিনা জানি না।'

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় কাশীধামের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে। ১৩১৫ কি ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের কথা। হাঁপানি পীড়ার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন। অপরাহ্নকালে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, কয়েকজন রোগীকে তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিচ্ছেন। খানিক পরে বৈঠকে এসে বসলেন ওখানকার কয়েকজন গণ্যমান্য লোক— কারুকেই চিনি না। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'ল, গিরিশচন্দ্র কখনো শোনেন, কখনো ধীর-স্থির ভাবে আলোচনায় যোগ দেন।

গিরিশচন্দ্রের সংলাপে সেদিন একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছিলুম। তাঁর মতামতের সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পরে জেনেছি, কেবল আলোচনা নয়, তাঁর তর্ক করবার শক্তিও ছিল অসাধারণ। পরিব্রাজক ও প্রচারকরূপে পৃথিবী জুড়ে বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়ে এসেছেন যে তীক্ষ্ণধী স্বামী বিবেকানন্দ, তর্কযুদ্ধে তিনিও গিরিশচন্দ্রকে এঁটে উঠতে পারতেন না। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কেবল বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন না, দখল ছিল তাঁর নানা শাস্ত্রের উপরে। তিনিও তর্কের শেষে গিরিশচন্দ্রকে

বলেছিলেন, 'তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধুলো দাও।' তারপর স্বামী বিবেকানন্দের দিকে ফিরে বললেন, 'আর কিছু না, his intellectual power মানতেই হবে।'

অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে আলোচনা শুনলুম। কিন্তু সেদিন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে কথা কইবার সুবিধা হ'ল না এবং তারপরেও আর কোনদিন হয় নি, কারণ পরদিনই কাশীধাম ত্যাগ করি।

তিন

বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" রচনা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত করেছিলেন বাঙালীদের। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস "দীপনির্বাণ"ও বাংলাদেশে অল্প উত্তেজনার সৃষ্টি করে নি। কারণ ওখানি হচ্ছে বাংলাদেশে মহিলা-রচিত প্রথম উপন্যাস। বোধকরি তা রচিত হয় "দুর্গেশনন্দিনীর" কিছুকাল পরেই ; তবে এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

বাঙালীদের মধ্যে কেবল প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক ব'লেই স্বর্ণকুমারী দেবীর এত নাম নয়। তাঁর রচনা-শক্তি ছিল বহুধা বিভক্ত। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্প লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন, গান লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন এবং বহুকাল ধ'রে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পত্রিকা "ভারতী" সম্পাদনা করেছেন।

তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দিদি। রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েক-জন অগ্রজ রচনাশক্তির জন্যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরাও স্বর্ণকুমারীর মত সাহিত্যের নানা বিভাগে হস্তার্পণ করতে পারেন নি। তরুণ বয়স থেকে প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাঁর প্রায় সারা জীবনটাই কেটে গিয়েছিল সাহিত্য-সাধনার ভিতর দিয়েই।

এমন অনেক মহিলা লেখিকা আছেন যাঁদের রচনার মধ্যে কৃতিত্বের প্রমাণ থাকলেও নারীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁরা মনে মনে নিজেদের পুরুষের সমকক্ষ ভেবে সাবধানে আপন আপন নারীত্বকে গোপন রাখবার চেষ্টা করেন। স্বর্ণকুমারীর

রচনায় এই কৃত্রিমতা ছিল না, তার সর্বত্রই প্রকাশ পেয়েছে লেখিকার সুমধুর নারীত্ব। বর্তমান কালে শ্রীমতী নিরূপমা দেবীর রচনার মধ্যেও এই গুণটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি।

"ভারতীর" সম্পাদিকারূপে তিনি বহু নবীন লেখক তৈরি ক'রে গিয়েছেন। তখনকার অধিকাংশ উদীয়মান লেখক নানাদিক দিয়ে তাঁর কাছে ঋণী— এখানে তাঁদের নাম দেবার চেষ্টা করলুম না, কারণ সে ফর্দ হবে অত্যন্ত দীর্ঘ। আজকালকার নবীন লেখকরা কলম ধ'রেই দক্ষিণা দাবি করেন। কিন্তু সে যুগে যাঁরা অল্পবিস্তর খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদেরও সাহিত্য-সেবা ছিল স্বার্থহীন। পারিশ্রমিক তো দূরের কথা, তখনকার "ভারতী", "সাহিত্য", "প্রদীপ", "সাধনা", "বঙ্গদর্শন" (নবপর্যায়) ও "প্রবাসী" প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় স্থানলাভ করতে পারলেই শক্তিশালী নবীন লেখকরা নিজেদের ভাগ্যবান ব'লে মনে করতেন। এই শ্রেণীর লেখকরা তখন বোধ হয় সব চেয়ে বেশী উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করতেন স্বর্ণকুমারীর কাছ থেকেই। অন্ততঃ নিজের কথা তো জানি, কখনো মুখে এবং কখনো বা পত্রে তাঁর কাছ থেকে যে কত উৎসাহ ও কত মূল্যবান উপদেশ পেয়েছি, সে কথা আজও ভুলতে পারি নি। তখন আমার বাড়ী থেকে বালীগঞ্জে আসা-যাওয়ার পথ সুগম ছিল না এবং টেলিফোন প্রভৃতিরও এত সুবিধা ছিল না, কিন্তু প্রতি মাসে অন্ততঃ চারপাঁচখানি পত্র লিখে আমার সঙ্গে তিনি সংযোগ স্থাপন করতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তখনকার অন্যান্য যে সব উদীয়মান লেখক স্বর্ণকুমারীর সংসর্গে এসেছিলেন তাঁরাও একবাক্যে আমার উক্তিরই প্রতিধ্বনি করবেন। কারণ প্রত্যেক নবীন লেখককেই তিনি সমান ভালোবাসতেন। "ভারতী"তে আশ্রয় পেয়েই আমি সর্বপ্রথমে পাঠকসমাজের দৃষ্টি

আকর্ষণ করি। তার আগেও আমি কয়েকখানি ছোট-বড় পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলুম বটে, কিন্তু সে ছিল আমার হাত-মক্সের যুগ।

যতদূর মনে পড়ে, "ভারতী"তে আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। উড়িষ্যার শিল্প-সম্পর্কীয় প্রবন্ধ। আমি ঐ শ্রেণীর আরো কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছি শুনে স্বর্ণকুমারী চিঠি লিখে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আহ্বান করলেন।

বালীগঞ্জের 'সানি-পার্কে' তাঁর সুসজ্জিত বাসভবন। নির্দিষ্ট দিনে বৈকালবেলায় সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। বেয়ারা একতলার একখানা হল-ঘরে নিয়ে গেল। দেওয়ালে শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের আঁকা ছবি, মেঝের উপরে কার্পেট পাতা, সোফা, কৌচ, চেয়ার, টেবিল ও আধুনিক গৃহসজ্জার অন্যান্য মূল্যবান উপকরণের অভাব নেই। যেখানে যেটি মানায় তাই দিয়ে পরিপাটি ক'রে সাজানো।

স্বর্ণকুমারী দেবী এলেন। বয়স তখন তাঁর পঞ্চাশ পার হয়েছে বোধ হয়, মাথার চুল সাদা হয়ে এসেছে, কিন্তু তখনো তিনি অপরূপ সুন্দরী। যেমন চমৎকার গঠন, তেমনি সুশ্রী মুখ-চোখ, গায়ের রংও পাকা ডালিমের মত। তাঁর মত রূপবতী লেখিকা আমি বাংলাদেশে আর দেখি নি।

তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা হবার পর বেয়ারা একথালা খাবার নিয়ে এল। বাড়ীতে তৈরি খাবার।

স্বর্ণকুমারী বললেন, 'খাও। তোমার জন্য তৈরি ক'রে রেখেছি।' তারপর স্নেহময়ী জননীর মত সামনে ব'সে আমাকে একে একে সব খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না।

তারপর অনেকবার গিয়েছি তাঁর কাছে, কিন্তু কোনবারই

খাবার না খেয়ে ফিরি নি। তাঁর কড়া হুকুম ছিল, যাবার আগে তাঁকে চিঠি লিখে জানাতে হবে। একবার কোন খবর না দিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম ব'লে তাঁর সে কি রাগ, কি ভর্ৎসনা! বললেন, 'এখানে কি খাবারের দোকান আছে, এখন তোমাকে কি খাওয়াই বল তো? কোন খবর পাই নি, তোমার জন্যে খাবারও তৈরি ক'রে রাখি নি।' তখনকার বালীগঞ্জে এখনকার মত সারি সারি খাবারের দোকান ছিল না।

আমি বললুম, 'যেদিন আসি, সেইদিনই তো খাবার খেয়ে যাই, একদিন না-হয় নাইই বা খেলুম!'

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না, ও-সব আমি পছন্দ করি না। এবার খবর না দিয়ে এলে আমি তোমার সঙ্গে দেখাই করব না।'

এমনি আদর-যত্ন ও মিষ্ট ব্যবহার তাঁর কাছ থেকে লাভ করতেন প্রত্যেক নবীন লেখকই, তিনি কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করতেন না। তাঁর বাইরে ছিল নব্য বাংলার হাল-ফ্যাসনের সাজ, কিন্তু মনে মনে ছিলেন তিনি চিরন্তন বাংলার খাঁটি গৃহলক্ষ্মীর মত।

রবীন্দ্রনাথের একটি আশ্চর্য অভ্যাস ছিল। লোকের সঙ্গে আলাপ করবার সময়ে একাসনে একভাবে স্থির হয়ে ব'সে তিনি কাটিয়ে দিতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই অভ্যাস ছিল স্বর্ণকুমারীরও। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেও তাঁকে একটু এদিকে বা একটু ওদিকে ফিরে বসতে দেখিনি। তাঁর কোন দৈহিক চাঞ্চল্য ছিল না, প্রসন্নমুখের দৃষ্টি ছিল প্রশান্ত, তিনি কথা কইতেন ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে এবং তাঁর গলার আওয়াজও ছিল সুমিষ্ট।

স্বর্ণকুমারীর বাড়ীতেই মাঝে মাঝে আর একটি হাস্যমুখ তরুণের সঙ্গে দেখা হ'ত, সেই পরিচয় পরে পরিণত হয় বন্ধুত্বে।

তখন ছিলেন তিনি প্রাচ্য চিত্রকলার শিক্ষার্থী। এখন তাঁর নাম ভারতবিখ্যাত। তিনি হচ্ছেন শ্রীঅসিতকুমার হালদার। তিনি কেবল লক্ষ্ণৌ চিত্র-বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ নন, তাঁর হাতে কলমও চলে ভালো।

সুধাকৃষ্ণ বাগচী নামে এক যুবক স্বর্ণকুমারীকে একবার ভারি বিপদে ফেলেছিল। তার লেখবার সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। তার একখানা পা ছিল কাঠের আর সে যা তা কথা কইতে পারত অনর্গল। কেমন ক'রে সে স্বর্ণকুমারীর স্নেহলাভ করে, তিনি তাকে নিজের বাড়ীতেই আশ্রয় দেন। হঠাৎ পূজার "ভারতী"তে সুধাকৃষ্ণের এক রচনা দেখে আমার চক্ষু স্থির। লেখাটি বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তর" থেকে বেমালুম চুরি! পত্রে সে কথা স্বর্ণকুমারীকে জানালুম। উত্তরে তিনি লিখলেন—'হেমেন্দ্র, লজ্জায় আমার মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে। হয়তো সবাই ভাবছে "ভারতী"র মত পত্রিকার সম্পাদিকা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়েন নি! কিন্তু কি করব বল, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে সুধাকৃষ্ণ এমনভাবে আমাকে শোনালে, আমি কিছুই ধরতে পারি নি। সুধাকৃষ্ণকে আমার বাড়ী থেকে চ'লে যেতে বলেছি।' এই সুধাকৃষ্ণ বড় গুণী ছেলে। পরে সে "জাহ্নবী"র (নবপর্যায়) সম্পাদক হয় এবং আমার একখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি চুরি ক'রে নিজের নামে পুস্তকাকারে ছাপিয়ে দেয়। সে এখন ইহলোকে নেই।

স্বর্ণকুমারী একবার আমার উপরেও রাগ করেছিলেন। প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। গোমো জংসনে ডি-কষ্টা নামে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকের মস্ত একখানি বাংলো ছিল, সেইখানে গিয়ে আমি দুই মাসকাল কাটিয়ে এসেছিলুম। বাংলো

খানির অবস্থান বড় চমৎকার, একেবারে আমার মনের মত। কাছে লোকালয় নেই। চারিদিকে নিবিড় বনানীর মর্মরমুখর শ্যামলতা। বাংলোর হাতা যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে পাহাড়ের পর পাহাড়, এবং তাদের কোল ঘেঁষে চ'লে গিয়েছে নদীতে যাবার পায়ে-হাঁটা পথ। আরো দূরে তাকালে সর্বদাই দেখা যায় মেঘচুম্বী পরেশনাথ পাহাড়, শিখরে যার শুভ্র মন্দিরমুকুট। চোখের সামনেই দেখতুম বনে বনে মৃগযুথের নয়নমোহন বিচরণ। সেখান থেকে ফিরে এসে স্বর্ণকুমারীর কাছে বাংলোখানির বর্ণনা ক'রে বলেছিলুম, বাড়ীখানা ডি-কষ্টা সাহেব বিক্রী করতে চান। আমার মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে বাংলো-খানি কেনবার জন্যে তিনি উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। তার কয়েক-দিন পরেই স্বয়ং বাংলোখানি দেখে এসে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই: 'হেমেন্দ্র, তুমি কি আমাকে ডাকাতের হাতে সমর্পণ করতে চাও, না হিংস্র জন্তুর জঠরে পাঠাতে চাও? যা দেখে এলুম, তা বাংলো না বাঘের বাসা? পালিয়ে আসবার পথ পাই না। এ তোমার সাংঘাতিক কবিত্ব!'

স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে আরো অনেক গল্প বলতে পারি, কিন্তু আপাততঃ এখানে স্থানাভাব। কেবল তাঁর সঙ্গে শেষ-দেখার কথা ব'লে এ-প্রসঙ্গ শেষ করব।

শুনেছি কুচবিহারের রাজকন্যার সঙ্গে তিনি নিজের পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন ব'লে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ তাঁর পরিবারের কেউ যে ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করেন, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। কথাটা কতখানি সত্য তা জানি না। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর

মনেও যে শেষ পর্যন্ত নিজের ব্রাহ্মণত্বের গর্ব পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল, নীচের কাহিনীটিই তার প্রমাণ।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি স্বর্ণকুমারীর জন্যে এক অভিনন্দন-সভার আয়োজন করে এবং আমি সেখানে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্যে আহূত হই। স্বর্ণকুমারী তখন অতি প্রাচীনা। সভার শেষে তিনি আমাকে কাছে ডেকে বললেন, 'হেমেন্দ্র, তোমার "ঝড়ের যাত্রী" উপন্যাস পড়লুম।'

শুধোলুম, 'আপনার কেমন লাগল?'

—'উপন্যাস হিসাবে ভালোই লাগল, কিন্তু তুমি বামুনের মেয়েকে নায়িকা ক'রে নমঃশূদ্র নায়কের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছ কেন?'

—'আমার কি করা উচিত ছিল?'

—'বৈদ্য জাতের মেয়ের সঙ্গে নমঃশূদ্র ছেলের বিবাহ দিলে না কেন?'

আমি জাতে বৈদ্য। আমাদের জাতের মেয়ের সঙ্গে নমঃশূদ্রের বিবাহ দিলে তাঁর কোনই আপত্তি থাকত না, কারণ তিনি নিজে ব্রাহ্ম হ'লেও ব্রাহ্মণ-কন্যা!

চার

অমৃতলাল ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। বাবার মুখে তাঁর কথা শুনেছি এবং বাবার কেতাবের আলমারিতেও দেখেছি অমৃতলালের দ্বারা উপহৃত ও তাঁর নিজের হাতে সই করা 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রভৃতি পুস্তক।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার ও বাক্যালাপ করবার সুযোগ পাই প্রায় যৌবন-সীমা পার হয়ে। তবে তরুণ বয়সেই একবার তাঁর পাশে ব'সে অভিনয় দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল বটে। সে হচ্ছে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কথা। "কোহিনূর থিয়েটারে"র প্রথম অভিনয়-রজনী, অভিনেয় নাটক ছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের "চাঁদবিবি"। রঙ্গালয়ে তেমন জনতা তার আগে আর কখনও দেখি নি। বহুকষ্টে চার টাকা দিয়ে দোতলার 'ড্রেস-সার্কেলে'র একখানি টিকিট কিনে আসন গ্রহণ করলুম। অভিনয় আরম্ভের খানিকক্ষণ পরে আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন অমৃতলাল এলেন, প্রেক্ষাগারে তখন কোন আসনই খালি নেই। কাজেই তাঁদের দুজনের জন্যে তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা হ'ল এবং অমৃতলাল বসলেন একেবারে আমার পাশেই। তাঁর রুপালী, চিকণ, দীর্ঘ কেশদাম, শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখ ও বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু আমার কাছে অপরিচিত ছিল না, কারণ তাঁকে একাধিকবার দেখেছি রঙ্গমঞ্চে ও বক্তৃতামঞ্চে। অমৃতলাল সেদিন প্রায় ঘণ্টাখানেক ব'সে অভিনয় দেখলেন এবং দেখতে দেখতে পাশের বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন— সাধারণ আলাপ নয়, রীতিমত রসালাপ। বাংলাদেশে আজকাল বোধ হয়

সংলাপ করবার শক্তির অভাব হয়েছে। আগে রবীন্দ্রনাথ ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে চমৎকার সংলাপ শুনেছি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই শক্তির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ব্যাধি ও বার্ধক্য তাঁর কণ্ঠকে প্রায় বন্ধ ক'রে ফেলেছে। অমৃতলালও অপূর্ব সংলাপের দ্বারা যে কোন আসর একেবারে জমিয়ে তুলতে পারতেন।

অমৃতলাল প্রথমে ছিলেন নট, তারপর হন নাট্যকার। গিরিশচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ছোট হয়েও তাঁরও আগে তিনি করেছিলেন নাটক-রচনার জন্যে লেখনীধারণ। বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রহসনে অমৃতলালের জুড়ি কেউ আছেন ব'লে জানিনা। কিন্তু কেবল প্রহসন নয়, তিনি পাঁচ-পাঁচখানি নাটকও রচনা ক'রে গিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল মিত্রের সমকক্ষ না হ'লেও অভিনয়েও তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। যদিও নিছক গম্ভীর রসে তাঁর দক্ষতা ততটা খুলত না, কিন্তু 'সিরিয়ো-কমিক' ভূমিকায় তিনি বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিতে পারতেন। নীলকমল (সরলা), বিহারী খুড়ো (তরুবালা) ও নিতাই (খাসদখল) প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হ'ত অতুলনীয়। "প্রফুল্ল" নাটকের রমেশের ভূমিকাতেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কবিতা রচনাতেও তাঁর হাতযশ ছিল এবং সেক্ষেত্রে তাঁর রচনাশক্তি আধুনিক না হলেও সুমিষ্ট ঘরোয়া শব্দ চয়ন ক'রে তিনি কবিতাগুলিকে উপভোগ্য ক'রে তুলতেন। গান রচনাতেও তাঁর বাহাদুরি ছিল যথেষ্ট এবং তাঁর কয়েকখানি গান অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। এই হ'ল তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমার রচিত একখানি দুই অঙ্কের কৌতুক-নাটিকা (প্রেমের প্রেমারা) মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্যে

নির্বাচিত হয়েছিল। অমৃতলাল তখন উক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে কোনদিক দিয়ে সম্পর্কিত না হয়েও, পালাটি যেদিন পাঠ করা হয় সেদিন দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাটিকা-খানি শুনে খুসি হয়ে তিনি তার মহলার ভার নিজের হাতেই গ্রহণ করতে চান, কোনরকম পারিশ্রমিক না নিয়েই। বলা বাহুল্য, "মিনার্ভার" কর্তৃপক্ষ সাগ্রহে সম্মত হয়েছিলেন তাঁর প্রস্তাবে। সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় স্থাপনের সুযোগ হয়।

গিরিশ-যুগে মহলা দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথাই শ্রবণ করেছি, যদিও এ-বিষয়ে বিখ্যাত গিরিশ-অর্ধেন্দু কিভাবে মহলা দিতেন তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। গিরিশচন্দ্রকে 'গুরুদেব' ব'লে স্বীকার করতেন অমৃতলাল এবং গিরিশচন্দ্র যখন ষ্টার থিয়েটারে ছিলেন, তখন গিরিশচন্দ্রের নির্দেশে অনেক সময়ে তিনিই মহলার ভার গ্রহণ করতেন। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত নাট্যাচার্যের মহলা দেওয়ার পদ্ধতি দেখতে পাব ব'লে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

তখনকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ নট-নটীই আমার নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন— যেমন মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), কার্তিকচন্দ্র দে, কুসুমকুমারী, চারুশীলা ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী প্রভৃতি। শেষোক্ত অভিনেত্রী ছাড়া আর সকলেই এখন স্বর্গত। প্রেক্ষাগারের প্রথম সারের আসনে ব'সে অমৃতলাল মহলা দেখতে লাগলেন এবং দেখতে দেখতে হাস্য-পরিহাসের সঙ্গে বলতে লাগলেন নাট্যশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ নানা কথা। নট-নটীদের প্রবেশ ও প্রস্থান হওয়া উচিত কি রকম, সংলাপের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা, মৌলিক কথার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির সঙ্গতি প্রভৃতি নিয়ে এক-একবার

মতামত প্রকাশ করেন এবং এক-একবার আলবোলার নলে মুখ লাগিয়ে ধূমপান করতে থাকেন।

এক জায়গায় চারুশীলার ভূমিকায় একটি গানে 'আমার হৃদয়-দোলা দোদুল দোলে' এই জাতীয় কি কথা ছিল।

অমৃতলাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'চারু, হৃদয়-দোলা কেমন ক'রে দোলে দেখাও তো!'

চারুশীলা লাজুক হাসি হেসে বললেন, 'আজ্ঞে, আপনি দেখিয়ে দিন না!'

অমৃতলাল তখনি দেখিয়ে দিলেন, তাঁর জরাজীর্ণ দেহেও সেই সরস ভঙ্গি হ'ল অপূর্ব।

তারপর ১৩৩৪ সালের শেষের দিকে মিনার্ভা থিয়েটারে যখন অমৃতলালের শেষ নাটক "যাজ্ঞসেনী" খোলবার আয়োজন হয়, তখন তার মহলায় আমি নিয়মিতরূপে হাজির থাকতুম। সেই সময়েই তাঁর মহলা দেবার পূর্ণশক্তি আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। কি পুরুষ-ভূমিকা, কি নারী-ভূমিকা, কি কবিতায়, কি গদ্যে সংলাপ, কি অঙ্গবিন্যাস, কি ভাবাভিব্যক্তি, —প্রত্যেক দিকেই থাকত তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং প্রত্যেক বিষয়টি তিনি তাঁর নিজের দেহের ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে বিশদ ক'রে তুলতে পারতেন—এমন কি আলোকপাত, দৃশ্যপট ও অঙ্গ সংস্কার বা দেহ-সজ্জা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ না ক'রে ছাড়তেন না।

"যাজ্ঞসেনী"র মহলার সময়ে এক-একদিন তাঁর সঙ্গে ছোটখাটো আলোচনা করবারও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হইনি।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললুম, 'আপনি এ পালাটিতে মাঝে মাঝে গদ্য, আবার মাঝে মাঝে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার

করেছেন। কিন্তু আজকালকার অনেক সমালোচক ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ মোটেই পছন্দ করেন না।'

মুখ থেকে আলবোলার নলটি সরিয়ে অমৃতলাল বললেন, 'সমালোচকরা পছন্দ না করলে হবে কি, কিন্তু অভিনয়ের পক্ষে ভাঙা অমিত্রাক্ষরের উপযোগিতা যে কতখানি, অত-বড় সাহিত্যিক দ্বিজেন ঠাকুর পর্যন্ত অনেকদিন আগেই তা স্বীকার ক'রে গিয়েছেন। এই ছন্দটি প্রথমে প্রবর্তন করেন আর একজন সাহিত্যিকই, তিনি মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ। তারপর যথাক্রমে রাজকৃষ্ণ রায় আর গিরিশচন্দ্র নাটক রচনায় এই ছন্দটিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের দ্বারা বার বার ব্যবহৃত হয়েছে ব'লেই এই ছন্দটির প্রচলন এতটা বেড়ে উঠেছে, আর সেই জন্যেই তার নাম দেওয়া হয়েছে "গৈরিশী-ছন্দ।"

আমি বললুম, 'কিন্তু কি গিরিশচন্দ্র, কি রাজকৃষ্ণ রায়, আর কি কালিপ্রসন্ন সিংহ, এঁরা কেহই এ-ছন্দের জন্য বাহাদুরি নিতে পারেন না।'

—'কেন পারেন না?'

—'কারণ এ ছন্দের প্রবর্তক হচ্ছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদনই।'

অমৃতলাল সোজা হয়ে ব'সে বললেন, 'আপনি কি বলছেন!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। মাইকেল তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'তে সর্বপ্রথমে অভিনয়ের উপযোগী ভাষা খোঁজবার জন্যে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে স্থানে স্থানে অল্প-স্বল্প পরীক্ষা করেছিলেন। সুতরাং তাঁকেই অনায়াসে এর প্রবর্তক বলা চলে।'

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অমৃতলাল আবার বললেন, 'আপনি কি বলছেন! এটা কি আপনার শোনা কথা?'

—'আজ্ঞে না, নিজের চোখে দেখেই বলছি। আপনিও "পদ্মাবতী" নাটক খুঁজলে অন্ততঃ নয়-দশ জায়গায় ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের নমুনা দেখতে পাবেন।'

অমৃতলাল উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'দেখব, আজই বাড়ীতে গিয়ে দেখব। কি আশ্চর্য, চোখের সামনে থেকেও এত-বড় কথাটা আজ পর্যন্ত গুপ্তকথা হয়েই আছে, আমাদের কারুরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি!'

অমৃতলাল ছিলেন অত্যন্ত সামাজিক মানুষ। গত যুগের প্রায় প্রত্যেক অভিনেতাই—এমন কি গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর পর্যন্ত—সত্যকার সামাজিক অনুষ্ঠানকে সাধ্যমত পরিহার ক'রেই চলতেন। কিন্তু অমৃতলালকে দেখেছি আমরা বহু সভা-সমিতিতে এবং সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বৈঠকে। যে কোন সভা তাঁর উপস্থিতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত, কারণ রসালো ভাষায় বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসামান্য। ছোট-বড় বৈঠকেও তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হ'ত যে বাক্য-স্রোত, তা রসের স্রোত বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি একাধারে ছিলেন সুরসিক ও সুপণ্ডিত। তাই তাঁর লঘু কৌতুক-ভাষণের মধ্যেও লাভ করা যেত যথেষ্ট চিন্তার খোরাক।

অধিকাংশ স্থলেই লক্ষ্য করেছি, গত যুগের বড় বড় বা ছোট ছোট অভিনেতারা আধুনিক যুগের অভিনেতাদের তেমন আমল দিতে চান না। কিন্তু অমৃতলাল ছিলেন একেবারেই এ দলের বাইরে। এ কালের অভিনেতাদেরও তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও সহানুভূতির চোখে দেখতেন এবং নিজে পুরাতন ধারায় অভ্যস্ত হয়েও কোন দিন তিনি নবযুগের অভিনয়-ধারাকে নিন্দা বা ব্যঙ্গ করতেন না। তিনি সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করতেন নবযুগের

প্রবর্তক শিশিরকুমারকেই। ১৩১৫ সালের পয়লা আশ্বিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে অর্ধেন্দুশেখরের যে স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বক্তৃতা দিতে উঠে অমৃতলাল বলেছিলেন, 'পার্টে জীবন দেবার ক্ষমতা ছিল তার (অর্ধেন্দুর) অপূর্ব। এ যুগে দেখতে পাই তা একমাত্র শিশিরের আছে। 'ষোড়শী'র জীবানন্দের মত **wretched part-এ dignity** দেওয়া একমাত্র শিশিরেরই সম্ভব।' "নাট্যমন্দিরে" শিশিরকুমারের বৈঠকে এসেও মাঝে মাঝে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে দেখেছি।

সুরাদেবীর প্রসাদে অমৃতলালের অরুচি ছিল না। একাধিকবার তাঁর কাছে গিয়ে বুঝেছি, তিনি মদ্যপান করেছেন, কিন্তু কখনো তাঁকে মত্ত অবস্থায় দেখিনি। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের মত আমাদের চোখের সামনে বসে কোন দিন তিনি সুরার প্রসাদ গ্রহণ করেন নি। যে রামকৃষ্ণদেবকে গিরিশচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার ব'লে পূজা করতেন, তাঁর এবং দক্ষিণেশ্বরের অন্যান্য ভক্তগণের সম্মুখেও তিনি অম্লানবদনে সুরাপান করতে লজ্জিত হন নি। কিন্তু অমৃতলালের বোধ করি কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা ছিল। যদিও কাগজে-কলমে তিনি এ গোপনতাকে প্রশ্রয় দেন নি। "অমৃত-মদিরা"য় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

'আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার,
বিনীর বাড়ীতে গিয়ে খেতাম বিয়ার।'

'গুরুদেব' হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র। 'বিনী' হচ্ছেন আগেকার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিনোদিনী।

"যাজ্ঞসেনী" অমৃতলালের কেবল শেষ নাটক নয়, শ্রেষ্ঠ নাটক। ঐ পালাটি অভিনীত হবার কিছুদিন পরেই তিনি পৃথিবীর নাট্যশালা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

পাঁচ

রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশেষ ভাবে বিকশিত হবার পরে যে কয়জন শক্তিধর সাহিত্য-শিল্পী বাঙালীদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বাংলা ভাষায় হাসির গান হচ্ছে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁর আগেও এখানে হাসির গান ও কবিতার অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাই ও-দুটি বস্তুকে উচ্চ-সাহিত্যে উন্নীত করতে পেরেছে। তাঁর ঐ শ্রেণীর গানে বা কবিতায় যে-সব মিলের বিস্ময়, যেমন শব্দ নিয়ে খেলা, অভিনব ছন্দের লীলা ও বিচিত্র প্রয়োগনৈপুণ্য দেখা যায়, অন্যত্র তা দুর্লভ। সাধারণ সঙ্গীত রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলাদেশে আর কেউ তাঁর চেয়ে বেশী অগ্রসর হ'তে পারেন নি। তাঁর দেশপ্রেমের গানও সারা বাংলাকে মাতিয়ে তুলেছিল। তাঁর রচিত "ধন-ধান্য-পুষ্পভরা" ও "বঙ্গ আমার, জননী আমার" প্রভৃতি সঙ্গীতের তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও নিজের গানে নিজেই নিপুণ ভাবে সুর সংযোজনা করতে পারতেন। তাঁর কবিতাগুলিও নূতনত্বে ও স্বকীয় বিশেষত্বে অপূর্ব। গদ্য প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানা প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন।

কিন্তু তিনি জনতার হৃদয়-হরণ করেছিলেন নাটক রচনার দ্বারা। নাট্য-সাহিত্যে হাত না দিলে তিনি এতটা জনপ্রিয় হ'তে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর নাটকাবলীর মধ্যে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির অভাব নেই বটে, কিন্তু নাট্যকারের পুরুষোচিত জোরালো

ভাষা (যা তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতাতেও পাওয়া যায়), নূতন ধরণের 'ষ্টাইল' বা 'ভঙ্গী' এবং অভিনব কৌশলে চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতির জন্যে সেগুলি এমন অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে যে, উচ্চ বা নিম্ন দুই শ্রেণীকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁর নাটকগুলি আজ দীর্ঘকাল পরেও জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত হয়নি। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথ না থাকলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রধান লেখক ও নায়ক রূপে গণ্য হ'তে পারতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের মত দ্বিজেন্দ্রলালও দীর্ঘজীবনের অধিকারী হন নি। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পার হয়েই তাঁকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। আরো কিছুকাল জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই তিনি আরো কত সোনা ফলাতে পারতেন সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্রে।

বোধ করি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ। "অর্চনা" পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের মিনার্ভায় অভিনীত নূতন নাটক "দুর্গাদাসে"র একটি নিন্দাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং নাট্যকারের পক্ষ নিয়ে আমি তার প্রতিবাদ করি। দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আমার নাম নিশ্চয়ই তখন অপরিচিত ছিল, যদিও তার কিছুকাল আগেই ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলুম। তিনি তখন সুকিয়া স্ট্রীটে (এখন কৈলাস বসু স্ট্রীট) একটি বাসা-বাড়ীতে থাকতেন। সেইখানে 'জাহ্নবী' সম্পাদক স্বর্গীয় নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিতের সঙ্গে দুইদিন গিয়ে দেখেছিলুম একটি দোহারা চেহারার গৌরবর্ণ, শান্তগম্ভীর, সংযতবাক, প্রিয়দর্শন পুরুষকে। তিনিই দ্বিজেন্দ্রলাল। নলিনীবাবু নিজের পত্রিকার জন্যে তাঁর কাছ থেকে একটি হাসির গান চান। তিনি বললেন, 'আমি তো হাসির গান লিখি না। যদি 'সিরিয়ো-কমিক' কবিতা চান, দিতে পারি।' নলিনীবাবু তাইতেই রাজি। তাঁর অনুরোধে আর একদিন গিয়ে

দ্বিজেন্দ্রলালের কাছ থেকে আমি কবিতাটি নিয়ে আসি— তার নাম — 'কে সে বল সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক ?' দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল এইটুকু— আমার নাম পর্যন্ত তিনি জানতেন না।

এখন লোকমুখে শুনলুম, "অর্চনা"য় "দুর্গাদাস" সম্বন্ধে আমার মতামত পাঠ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল খুসি হয়েছেন। শুনে সাহসী হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি তখন নিজের বাড়ী "সুরধামে" উঠে এসেছেন।

আমাকে দেখেই দ্বিজেন্দ্রলাল চিনতে পারলেন। বললেন, 'কি খবর ? নলিনীবাবুর কাছ থেকে আসছেন বুঝি ?'

—'আজ্ঞে না, নিজেই আসছি।'

—'বসুন। কোন কথা আছে ?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। "অর্চনা"য় আমার লেখাটি আপনি পড়েছেন ?'

—'কোন্ লেখা ?'

—' "দুর্গাদাস" সমালোচনার প্রতিবাদ ?'

—'সেটি কি আপনার লেখা ? আপনিই হেমেন্দ্রবাবু ?'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম।

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, 'আমি আপনার লেখাটি পড়েছি। আমার ভালো লেগেছে। আমি দেখিয়েছি, আওরংজেবের দরবারের ভিতর থেকে দুর্গাদাস তরবারি খুলে চ'লে গেল। সমালোচক এটা অস্বাভাবিক ব'লে আমাকে ব্যঙ্গ করেছেন। আমিও জানি এটা ঐতিহাসিক সত্য নয়। কিন্তু ইতিহাস এটা স্বীকার করেছে যে, দুর্গাদাস মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে রাজধানী দিল্লীর মোগল-ব্যূহ ভেদ ক'রে অনায়াসেই আওরংজেবের নাগালের

বাইরে চ'লে গিয়েছিল। আপনি ঐ ঐতিহাসিক তথ্যটিকে দেখিয়ে দিয়ে ভালো কাজ করেছেন। নাটক আর ইতিহাস এক নয়। ইতিহাসকে হুবহু অনুসরণ করলে সংলাপে-গাঁথা ইতিহাস হ'তে পারে, কিন্তু নাটক হবে না। ঘটনা-সংস্থান, চরিত্রসৃষ্টি আর 'ড্রামাটিক অ্যাকসানে'র জন্যে নাট্যকার যদি ইতিহাসের গণ্ডীর ভিতরে থেকেও কিছু কিছু পরিবর্তন আর পরিবর্জনের সাহায্য না নেন, তা'হলে শ্রেষ্ঠ লেখকও ভালো নাটক লিখতে পারবেন না। সেক্সপিয়ার তাই করেছেন, আর সকলেও তাই করেছেন, আমিই বা তা করব না কেন?'

"সুরধামে"র "লনে" চেয়ারের উপরে ব'সে ব'সে কথাবার্তা হচ্ছিল। একে একে দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুরা আসতে লাগলেন। প্রথমে এলেন নাট্যকার দীনবন্ধুর পুত্র স্বর্গীয় ললিতচন্দ্র মিত্র, তারপর এলেন কবি ও প্রবন্ধকার স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার, তারপর এলেন লাখুটিয়ার জমিদার কবি দেবকুমার রায়-চৌধুরী। আমি বিদায় গ্রহণ করলুম।

আসবার সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, আপনি আমার ভক্ত জেনে সুখী হয়েছি। পারেন তো মাঝে মাঝে আসবেন।'

তা মাঝে মাঝে যেতুম বৈকি! সে ছিল এক চমৎকার বৈঠক, সন্ধ্যার পর সেখানে এসে জুটতেন তখনকার যত বড় বড় নাম-করা সাহিত্যিক এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন মধুলোভী মধুকরের মত। উপমাটির অপপ্রয়োগ হয় নি, কারণ কোন কোন সাহিত্যিক ছিলেন দ্রাক্ষাদেবীর অনুগত উপাসক এবং দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন পরিচিত অপরিচিত সকলেরই সামনে অবাধে অসঙ্কোচে সুরাপান করতেন, তেমনি আঙ্গুরবালার ভক্তদের

ভিতরে অকাতরে তরল আগুন বিতরণও করতে পারতেন।

একদিন কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল, "অর্চনা"র সহযোগী সম্পাদক কৃষ্ণদাস চন্দ্র ও কবি ফণীন্দ্রনাথ রায়ের (ইনি এখন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন এবং এখনো জীবিত) সঙ্গে "সুরধামে" গিয়েছি। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আদালত থেকে সদ্য-প্রত্যাগত। বেয়ারা এসে তাঁর জামা-কাপড় বদ্‌লে দিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপরে রেখে গেল সোডা ও সুরা ভরা গেলাস। ঠিক সেই সময়ে তাঁর দুই পাশে এসে দাঁড়ালেন দুই পুত্র-কন্যা— বালক দিলীপকুমার ও বালিকা মায়া। পূর্বোক্ত আগন্তুকদের কেহই মদ্যপ ছিলেন না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কথা কইতে কইতে সকলেরই সামনে সুরাপান করতে লাগলেন অম্লান-বদনে। সুরা যে ভালো জিনিষ, নিশ্চয়ই তিনি এটা বিশ্বাস করতেন না, কারণ তাঁর নানা রচনায় সুরার বিরুদ্ধে বহু কথাই আছে। কিন্তু সুরাপানের চেয়েও নিন্দনীয় হচ্ছে গোপনতা। আমি সুরাপান করি, কিন্তু মুখে তা স্বীকার করব না। এই মিথ্যা গোপনতা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এ হচ্ছে ভাবের ঘরে চুরি।

দ্বিজেন্দ্রলালের বৈঠকে যাঁদের প্রায়ই দেখেছি তাঁদের কেহই আর ইহলোকে বাস করেন না। ললিতচন্দ্র মিত্র (বড় মিষ্ট মানুষ ছিলেন তিনি), বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দেবকুমার রায় চৌধুরীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া আসতেন পক্ককেশ, কিন্তু সৌম্য-সুন্দর প্রসাদদাস গোস্বামী (যাঁকে আদর্শ করে "পরপারে" নাটকের দাদামশাইয়ের চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে), "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, আজ এ-কাগজ কাল ও-কাগজের সম্পাদক, কিন্তু পাকা লিখিয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল (তাঁর কথা পরে ভাল করে বলব) প্রভৃতি।

মাঝে মাঝে ললিতবাবুর অগ্রজ, দীনবন্ধু-পুত্র কবি বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রকেও দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া আরো কেউ কেউ আসতেন, কিন্তু তাঁরা সাহিত্যিক নন।

একদিন বিজয়চন্দ্র মজুমদার বললেন, 'দেখ দ্বিজু, থিয়েটারে তোমার "সাজাহান" নাটকে মহামায়া জাতীয় গানের সময়ে যে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে তাকে মোটেই বীরনারী ব'লে মনে হয় না।'

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, 'তা তো হয়ই না। মহামায়ার ভাব তখন এমনি-ধারাই হওয়া উচিত' ব'লেই চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে ব'সে, দুই বাহু পরস্পরের সঙ্গে বদ্ধ ক'রে অতিশয় এক দৃপ্ত ভাব ধারণ করলেন এবং তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে যেন ঠিকরে পড়তে লাগল দীপ্তিমান শক্তি!

দ্বিজেন্দ্রলাল কেন যে হঠাৎ তাঁর অনুরাগী রবীন্দ্রনাথের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে 'প্রবাসী' এবং 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁকে তীব্র ও অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ ক'রে তখনকার সাহিত্য-সমাজে প্রবল এক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, অনেকেরই কাছে সেটা রহস্যের মতই হয়ে আছে। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ওর মূলে ছিল সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জনকয়েক বন্ধুর প্ররোচনা। কারণ আমি ওঁদের স্বকর্ণে উস্কানি দিতে শুনেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ভাবে-ভোলা, উদার ও সরল বিশ্বাসী মানুষ। কিন্তু তাঁর কান পাৎলা ছিল, যুক্তিহীন হ'লেও বন্ধুদের কথা অবিশ্বাস করতে পারতেন না। এইটুকুই তাঁর দুর্বলতা।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ফুটপাতের উপরে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। পায়ে চটিজুতো, পরনে আধময়লা কাপড় ও বোতাম-খোলা পাঞ্জাবী,

উস্কোখুস্কো চুল— অতি সাধারণ চেহারা। কিন্তু ওরই মধ্যে তাঁর সেই অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত চক্ষুদুটিই তাঁকে রাজপথের জনতার ভিতর থেকে পৃথক ক'রে রেখেছিল। আমি তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম করতেই করুণ স্বরে বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু "অ্যাপোপ্লেক্সি" আমাকে আক্রমণ করেছে। কে যেন হঠাৎ ঘাড়ের উপরে ধাঁ ক'রে চড় মারলে, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। ডাক্তাররা বলেন, আবার এ ব্যাপার হ'লে আর বাঁচব না। তাঁদের হুকুমে এত সাধের মদ্যপানও ত্যাগ করেছি।'

কিন্তু সেইদিনই রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই তিনি সাহিত্যের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার কথা পেড়ে বললেন, 'পুরীষও স্বাভাবিক, কিন্তু তাই ব'লে পুরীষ কি সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য ?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন উৎকট বাস্তবতার ভক্ত অতি-আধুনিক লেখকরা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কারণ কয়েকদিন পরেই শুনলুম, সন্ন্যাস রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি কেবল "সুরধাম" নয়, ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

ছয়

আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের অধিকাংশ পালাই অভিনেতা ও রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই রচনা করতেন— যদিও এখানকার "পাবলিক থিয়েটার" গুলি গ'ড়ে ওঠে সর্বপ্রথমে সাহিত্যিকদেরই অবলম্বন ক'রে। ক্রমে অবস্থা এমন হ'য়ে দাঁড়ায় যে, বাইরের কোন নাট্যকারেরই রঙ্গালয়ের ভিতরে পাত্তা পাবার উপায় রইল না। তারপর এই ধারা বদলে দেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল।

ছু'জনেই ওঁরা সমবয়সী ছিলেন এবং ছু'জনেই করতেন কবিতা রচনা। বাল্যকালে "জন্মভূমি" ও অন্যান্য পত্রিকায় আমি ক্ষীরোদ-প্রসাদের রচিত কবিতা পাঠ করেছি। নাট্যকার রূপে বিখ্যাত হবার পরেও তিনি মাঝে মাঝে কবি ও সাহিত্যিকরূপে সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ছাড়েন নি।

তিনি ছিলেন রসায়ন-বিদ্যার অধ্যাপক এবং কাব্যরস ও নাট্য-রস নিয়েও সখের কারবার করতেন অবসরকালে। কিন্তু প্রথম প্রথম যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেও তিনি রঙ্গালয়ের দরজা খোলা পান নি। কোন বড় ও চল্‌তি রঙ্গালয়ের মালিকই তাঁকে কল্‌কে দিতে রাজি হলেন না। অবশেষে তাঁর কপাল ফিরল। "এমারেল্ড থিয়েটার" অত্যন্ত অচল অবস্থায় প'ড়ে তাঁর "ফুলশয্যা" নামে একখানি নাটক গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু তবুও নাট্যকাররূপে ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতে উঠতে পারলেন না, "এমারেল্ড থিয়েটার"ও বাঁচল না।

প্রায় বৎসর ছু'য়েক পরে আবার এক সুযোগ উপস্থিত হয়।

আমার দ্বারা সম্পাদিত "নাচঘরে" প্রকাশিত নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "আত্মজীবনী" পাঠ ক'রে জানতে পারি, "আলিবাবা" গীতিনাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ গিয়েছিলেন তাঁর কাছে এবং তিনিই নাকি পালাটির অধিকাংশ গান বেঁধে দেন ও বাকি কোন কোন গান গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির রচনা। অতুলবাবুই "আলিবাবা"র অভিনয়ের ব্যবস্থা ক'রে দেন। "ক্লাসিক থিয়েটার" নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় হয়েও তখন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছিল না এবং রঙ্গালয়ের সেই দুর্ভাগ্যই হ'ল ক্ষীরোদপ্রসাদের সৌভাগ্যের হেতু। সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠল "আলিবাবা"র অভিনয়, মালিকের ঘরে আসতে লাগল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বিজ্ঞাপনে "আলিবাবা"কে বলা হ'ল— "ক্লাসিকের বিজয়-বৈজয়ন্তী!"

এই "আলিবাবা"ই হ'ল ক্ষীরোদপ্রসাদের পক্ষে রঙ্গালয়ের প্রবেশপত্রের মত। পরের বৎসরেই (১৮৯৮ খৃঃ) "রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে" অভিনীত হয়ে তাঁর "প্রমোদরঞ্জন" গীতি-নাটকও জন-প্রিয়তা অর্জন করে। ঐখানে তাঁর "কুমারী" ও "বভ্রুবাহন" নাটকও পাদপ্রদীপের আলোক আসে। তার কিছুকাল পরেই তিনি প্রধান নাট্যকাররূপে ষ্টার থিয়েটারে যোগ দেন এবং ঐ সম্প্রদায়ের জন্যে একমাত্র "রঘুবীর" ছাড়া পর পর অশ্রান্তভাবে রচনা করেন "সপ্তম প্রতিমা", "সাবিত্রী" "বেদৌরা", "প্রতাপাদিত্য", "বৃন্দাবন-বিলাস", "রঞ্জাবতী" (১৯০৪ খৃঃ)। (এই সময়েই রঙ্গালয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মপ্রকাশ), "নারায়ণী", "পদ্মিনী", "উলুপী" ও "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি নাটক। রঙ্গালয়ে ক্ষীরোদ-প্রসাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল নির্দিষ্ট আসন।

রঙ্গালয়ের নট-নাট্যকাররা সাধারণতঃ নিজেদের রচনায় বা

ভাষায় কাব্যরস বা সাহিত্যরস বিতরণের চেষ্টা করতেন না। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে ছিলেন কবি, পরে তাই নাটকেও উচ্চশ্রেণীর কাব্যরসকে পরিহার করতে পারেন নি এবং এইজন্যে তাঁদের নাটক নট-নাট্যকারদের নাটকের চেয়ে পাঠ ক'রে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নাট্যজগৎ থেকে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ, জাতীয় ভাবদ্যোতক নাটক "প্রতাপাদিত্য" রচনা ক'রে। গত শতাব্দীতে যখন মহাত্মা গান্ধীও অচ্ছুত বা অস্পৃশ্যদের পক্ষাবলম্বন করেন নি, তখন তিনি "কুমারী" নাটকে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তাঁর "রঘুবীরে"ও হিংসা ও অহিংসা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর "আলমগীর" নাটকে দেখি, পরস্পরের প্রবল শত্রু হয়েও জাতির ও দেশের কল্যাণের জন্যে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হ'তে পারে। একদিকে তিনি যেমন হালকা কৌতুক-নাট্য রচনা ক'রে তরল আনন্দ বিতরণের চেষ্টা করেছেন, অন্য দিকে তেমনি বিদগ্ধমণ্ডলীর উপযোগী চিন্তার খোরাক যোগাতেও কুণ্ঠিত হন নি কিছুমাত্র।

"জাহ্নবী" পত্রিকার জন্যে লেখার তাগিদ দিতে গিয়ে সর্বপ্রথমে দেখি ক্ষীরোদপ্রসাদকে। একহারা দেহ, বর্ণ কৃষ্ণ, মুখ হাসিমাখা, সরল ও মিষ্ট কথাবার্তা, কোনরকম Pose বা ভঙ্গী নেই। দেখলেই সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কথা স্মরণ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে কাঁঠালপাড়ায় যাচ্ছিলুম। ঠিক কোন্ সালে মনে নেই, তবে একত্রিশ-বত্রিশ বৎসর আগের কথা। শিয়ালদহ স্টেশনে ক্ষীরোদপ্রসাদও আমাদের কামরায় এসে উঠলেন এবং সকলের

সঙ্গে একেবারে ঘরের লোকের মত গল্প জুড়ে দিলেন। খানিকক্ষণ পরে বুঝলুম, বয়সে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বভাব এখনো আছে বালকের মতই তাজা ও অকপট। প্রসঙ্গক্রমে আমি পুরাতন "জন্মভূমি"তে প্রকাশিত তাঁর রচিত একটি কবিতার কথা উল্লেখ করলুম।

তিনি শিশুর মত উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন, 'আপনি পড়েছেন? আপনি পড়েছেন? হ্যাঁ, সেটি আমার খুব ভালো কবিতা, প্রেরণা না পেলে তেমন কবিতা কেউ লিখতে পারে না!' তারপরেই তিনি সোজা হয়ে ব'সে, উচ্চকণ্ঠে ভাবভঙ্গীর সঙ্গে হাত নেড়ে গড় গড় ক'রে সেই তিন-চার যুগ আগেকার লেখা সমগ্র কবিতাটি আবৃত্তি ক'রে গেলেন। অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলুম, এত রাশি রাশি, ভারি ভারি নাটকের চাপেও এত বৎসর পরে একটিমাত্র স্বরচিত কবিতা তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি! নিশ্চয়ই নিজের রচনার উপরে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা!

আর একদিনও পেলুম বালকতার পরিচয়। ষ্টার থিয়েটারে তখনও "অযোধ্যার বেগম" খোলা হয়নি এবং শিশিরকুমারও দেখা দেন নি সাধারণ রঙ্গালয়ে। স্বর্গীয় বন্ধু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব'সে ব'সে আলাপ করছি, এমন সময়ে একখানি পাণ্ডুলিপি হাতে ক'রে ক্ষীরোদপ্রসাদের আবির্ভাব। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পরেই তিনি বললেন, 'এইবারে আমার নাটক প'ড়ে শোনাব।'

অপরেশচন্দ্র বললেন, "পড়ুন।"

কিন্তু নাটকপাঠের কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ আবার বললেন, 'এইবার আমার নাটক প'ড়ে শোনাব।'

অপরেশচন্দ্র নিরুত্তর। আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে ক্ষীরোদ-

প্রসাদ ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি ক'রে আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন— তাঁর দুই চক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্য। তখন ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলুম। আমিও একজন লেখক, আমার সামনে তিনি তাঁর নাটক পড়তে নারাজ— Plagiarism বা রচনাচৌর্যের ভয়ে! তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম, অপরেশচন্দ্র মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। রঙ্গালয় জায়গা ভালো নয়। এখানে কারুর উপরে কারুর বিশ্বাস নেই।

শিশিরকুমার যখন ম্যাডানদের দল ত্যাগ করেছেন, তখন স্বর্গীয় সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তার মুক্তি" নামে একখানি চমৎকার নাটিকা ওখানে অভিনীত হয়। তারপর থেকে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে কিছুদিন ধ'রে আমাদের দৈনিক আসর বসত। অনেক সাহিত্যিক ও শিল্পী বন্ধু আসতেন। ক্ষীরোদপ্রসাদও প্রায় আসা-যাওয়া করতেন, কারণ তিনি ছিলেন ম্যাডানদের বৈতনিক নাট্যকার। মুখে তাঁর সর্বদাই হাসিখুসি। মাঝে মাঝে থিয়েটারওয়ালাদের উপরে চ'টে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠতেন বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার ঠাণ্ডা জল! বজ্র আর বৃষ্টি। নাটক নিয়েও অনেক কথা বলতেন, বেশীর ভাগ নিজের নাটকেরই প্রসঙ্গ। সর্বদাই মশগুল হয়ে থাকতেন যেন স্বকীয় কল্পনালোকে।

একদিন স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আমার হাতে ভিক্টর হিউগোর একখানি নাটক দিয়ে বললেন, 'প'ড়ে দেখবেন। ভালো লাগে তো বাংলায় তর্জমা করবেন।'

নাটকখানি ভালো লাগল। তাকে অবলম্বন ক'রে বাংলায় একখানি নাটক রচনা ক'রে ফেললুম। কোন রঙ্গালয়ের মুখ তাকিয়ে নয়, খেলাচ্ছলে মনের খেয়ালে। রচনাটি বন্ধুমহলে পাঠ করলুম। সকলে সুখ্যাতি করলেন।

মণিলালের মুখে সেই নাটকের কথা শুনে ম্যাডানদের কর্ণধার (পরে "কালী ফিল্মসে"র মালিক) শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নাটকের পাণ্ডুলিপি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। ছুই-চার-দিন পরেই শুনলুম, নাটকখানি কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে অভিনয়ের জন্যে মনোনীত হয়েছে।

ভূমিকালিপি বিলি হয়ে গেল। মহলা আরম্ভ হয় হয়, এমন সময়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ এসে হাজির। অত্যন্ত বিচলিত ভাব, সকাতর মুখ। মণিলালকে ডেকে তফাতে নিয়ে গিয়ে উত্তেজিত ভাবে কি সব ব'লে আবার চ'লে গেলেন দ্রুতপদে।

মণিলাল আমার কাছে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'হেমেন্দ্র, ক্ষীরোদবাবুকে না জানিয়ে তোমার নাটক নেওয়া হয়েছে ব'লে উনি অভিমান করেছেন। তুমি কাল ওঁর বাড়ীতে গিয়ে নাটকখানি শুনিয়ে এস, তাহ'লেই উনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন।'

মণিলালের কথামতই কাজ করলুম। আমাকে দেখেই ক্ষীরোদপ্রসাদের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সাদরে নীচের একটি ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে খুব মন দিয়ে নাটকখানি শ্রবণ ক'রে দু-একটি জায়গা একটু বদলে দিতে বললেন। আমিও রাজি হলুম।

তারপর তিনি করুণ স্বরে বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।'

সবিস্ময়ে বললুম, 'ষড়যন্ত্র! কিসের ষড়যন্ত্র?'

—'ম্যাডানদের সাঙ্গোপাঙ্গরা আমাকে তাড়াতে চায়। তাই ওরা আপনার নাটক নিয়েছে।'

—'আপনার সঙ্গে আমার তুলনা? আমি তো নাট্যকারই নই!'

—'না হেমেন্দ্রবাবু, ওরা আমার মত বুড়ো নাট্যকার চায় না। ওরা চায় আধুনিক নাট্যকার। এ সব হচ্ছে ষড়যন্ত্র।'

তাঁর কাতর মুখ দেখে মায়া হ'ল আমার মনে। বললুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কোন ষড়যন্ত্রেই যোগ দেব না। নাট্যকার হবার ইচ্ছা আমার একটুও নেই।'

আমার নাটক কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে অভিনীত হয় নি। তারপর শিশিরকুমার সেখানি গ্রহণ করেছিলেন। তারপর গুরুদাস-লাইব্রেরীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে শিশিরকুমারের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে নিয়ে সেখানি আমি তাঁরই হাতে সমর্পণ করি, আর্ট থিয়েটারের জন্যে। সে পাণ্ডুলিপি আজ পর্যন্ত আমার হাতে আর ফিরে আসে নি। বোধ করি নাটকখানি রচনা করেছিলুম বিশেষ কোন অশুভ লগ্নে। সকলেরই ভালো লেগেছে, অথচ কারুরই কাজে লাগে নি।

সাত

আপনি কি শিস্ দেওয়া পছন্দ করেন? প্রশ্নটি এতই তুচ্ছ যে অনেকেই হয়তো উত্তর দেওয়াও আবশ্যক মনে করবেন না। অনেকে হয়তো স্পষ্ট ভাষায় বলবেন— 'না, নিশ্চয়ই করি না। ওটা হচ্ছে পাড়ার বখাটে ছোঁড়াদের নিজস্ব।' আবার অনেকে হয়তো মুখে কিছুই না ব'লে মনে মনে বলবেন— 'তা শিস্ দেওয়াটা খুব উল্লেখযোগ্য কাজ না হ'লেও মানুষের উঠতি বয়সে ওটা নিয়ে খানিকটা সময় মন্দ কাটে না বটে!' এবং এটা আমরা সকলেই জানি, বহুক্ষেত্রেই শিস্ দিলে শিষ্টতার পরিচয় দেওয়া হয় না। একটি দৃষ্টান্ত এই, গুরুজনের সামনে ব'সে শিস্ দিলে তাঁদের দ্বিতীয় রিপু প্রবল হয়ে উঠতে পারে। সময়ে সময়ে শিস্ হচ্ছে বিপদ-জনক। আদালতে গিয়ে শিস্ দিলে আপনার হবে জরিমানা।

কিন্তু শিস্ যে মর্যাদাকর হ'তে পারে, এটা আপনারা বিশ্বাস করেন কি? খালি মর্যাদাকর নয়, সাধনায় অবহিত হ'লে শিস্‌কেও আর্টের স্তরে উন্নীত করতে পারা যায়। আমেরিকায় থাকেন এক ভদ্রলোক, তাঁর নাম ফ্রেড ক্রোলি। তিনি অন্ধ। শিস্ দেওয়ার আর্টে তিনি এমনি পরিপক্ক যে, সর্বত্রই তাঁর অসামান্য খাতির। রেডিয়ো, টেলি-ভিসন ও গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে মাত্র এই শিস্‌কে অবলম্বন ক'রেই তিনি হয়েছেন বিপুল বিত্তের মালিক। আশ্চর্য তাঁর জনপ্রিয়তা। কেবল তাঁর শিস্ শোনবার জন্যেই অসংখ্য লোক তাঁকে বায়না দেয়।

প্যাডেরিউস্কির নাম আপনাদের জানা থাকতে পারে। তিনি

অবশ্য শিস্-দেনেওয়ালা নন, উচ্চতর শ্রেণীর শিল্পী। পিয়ানো বাজিয়ে তিনি কেবল য়ুরোপ-আমেরিকায় দিগ্বিজয় করেন নি, অমরত্ব অর্জন করেছেন। সঙ্গীতবিদ্‌রূপে অতিশয় জনপ্রিয় হ'তে পেরেছিলেন ব'লেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অর্থের দিক দিয়েও তাঁকে ধনকুবের বলা চলত।

ঐ দুটি লোকের নাম করলুম কেন, এইবারে সেই কথাই বলি। পিয়ানো হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের একটি বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। সুতরাং পিয়ানোর সুপটু বাদক যে যশস্বী হবেন, এজন্যে বিস্মিত হবার কারণ নেই ; কিন্তু শিস্ তো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। তাকে আর্ট ব'লে মানা দূরের কথা, আমরা তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না, তবু ওর মধ্যেও কেউ কেরামতি দেখাতে পারলে পাশ্চাত্য রসিকদের গুণগ্রাহিতার ফলে তিনি রীতিমত বিত্তশালী হয়ে উঠতে পারেন। এক্ষেত্রে এইটেই হচ্ছে দ্রষ্টব্য।

ক্যারুসো, শালিয়াপিন, মেল্‌বা ও প্যাটি প্রভৃতি ওদেশের গায়ক-গায়িকারা যত লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন, তা শুনলে আমাদের রাজা-মহারাজাদেরও মাথা ঘুরে যাবে। কিন্তু ওঁদের কথা ছেড়ে দি, কারণ ওঁরা তো হচ্ছেন বিশ্বের বাজারে বড় বড় রুই-কাত্‌লা। আমেরিকায় মেরিয়ান অ্যাণ্ডার্সন নামে একটি মেয়ে আছেন। তাও শ্বেতাঙ্গদের নয়, কাফ্রিদের মেয়ে—যারা হচ্ছে ইয়াঙ্কি মুল্লুকের হরিজন। মেরিয়ানের গানের গলা অসাধারণ, তবু শ্বেতাঙ্গদের অনেকেই তাকে দমিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। একবার ঘোষণা করা হ'ল, ওয়াশিংটন সহরে 'ইষ্টারে'র দিন মেরিয়ানের গানের আসর বসবে। কিন্তু কোথায় বসবে আসর, কোন রঙ্গালয়ই মেরিয়ানকে ঠাঁই দিতে রাজি হ'ল না। তার ম্যানেজার তখন

বাধ্য হয়ে আসর বসালেন মুক্ত আকাশের তলায়। নির্দিষ্ট তারিখে মেরিয়ানের গান শুনতে এল পঁচাত্তর হাজার শ্রোতা এবং তারা প্রত্যেকেই এসেছিল টিকিট ক্রয় ক'রে।

ও-দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এদেশের কি দুরবস্থাই চোখে পড়ে! সাহিত্যিক ও চিত্রকর প্রভৃতি শ্রেণীর দেশীয় শিল্পীদের তো কায়ক্লেশে ভাত-কাপড় জোগাড় করতে করতেই প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের আবেদন অধিকতর সার্বজনীন বটে, কিন্তু কয়জন গাইয়ে বা বাজিয়ে এখানে জীবনব্যাপী সাধনার পরও যোগ্য পুরস্কার লাভ করেন? বিশেষ বিশেষ কারণে কিংবা গুটিকয় ধনী গুণগ্রাহীর পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন ভাগ্যবান দেশীয় সঙ্গীতবিদ্‌কে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হয় না বটে, কিন্তু তাঁদের আঙুলের ডগায় গুণে ফেলা যায়। সংপ্রতি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ পরলোকে গমন করেছেন। শেষ জীবনে তাঁকেও রীতিমত অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করতে হয়েছিল। এদেশে শিস্ দিয়ে ধনী হওয়া তো স্বপ্নাতীত ব্যাপার, প্রথম শ্রেণীর তুলনাহীন সঙ্গীতবিদ্‌কেও এখানে কঠোর জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ইহকাল কাটিয়ে দিতে হয়। আজ এই রকম এক অদ্বিতীয় গুণীর সঙ্গেই আপনাদের পরিচয় সাধন ক'রে দেব।

করমতুল্লা খাঁ ও ককুভ খাঁ দুই ভাই, ভারতের উত্তর-পশ্চিমে তাঁদের জন্ম। তাঁরা ঘরানা শিল্পী—অর্থাৎ সঙ্গীতকে অবলম্বন করেছিলেন বংশানুক্রমে।

স্বদেশে নাম কিনে তাঁরা য়ুরোপেও গিয়েছিলেন। পারী-সহরের প্রদর্শনীতে ভ্রাতৃদ্বয়ের গুণপনা য়ুরোপীয় রসিকদেরও যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল।

মসজীদবাড়ী (এখন হেমেন্দ্র সেন) স্ট্রীটের স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্র-

নাথ বসু ছিলেন ধনবান ও চারুকলাগত প্রাণ। রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের "বাংলার ইতিহাস" নামে সুবিখ্যাত প্রকাণ্ড গ্রন্থ তাঁরই অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বাড়ীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের একটি জমজমাট মজলিস বসত। সেখানে সহরের নামজাদা গাইয়ে-বাজিয়েদের আমন্ত্রণ করা তো হ'তই, তা ছাড়া আমন্ত্রিত হতেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গুণী ব্যক্তিরাও। বলা বাহুল্য, তাঁরা উপযোগী দক্ষিণারও অভাব অনুভব করতেন না।

ঐ আসরেই একদিন দেখতে পেলুম একটি চিত্তাকর্ষক মূর্তিকে। শ্যামবর্ণ, বিপুল ও সুদীর্ঘ দেহ। গম্ভীর আনন, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, ভাবব্যঞ্জক দৃষ্টি। দীর্ঘ কেশ, মুখে গোঁপদাড়ী। মাথায় টুপী, পরোনে পশ্চিমা মুসলমানের পোষাক। বয়স ষাটের কম নয়। সাজসজ্জা দস্তুরমত পরিপাটি ও সৌখীন। শুনলুম উনিই হচ্ছেন ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ। আসরের সবাই ডাকছেন খাঁ-সাহেব ব'লে।

প্রথমে গায়কদের গান চলল, খাঁ-সাহেব বাক্যহীন মুখে একেবারে মূর্তির মত স্থির হয়ে ব'সে রইলেন। রাত সাড়ে নয়টা কি দশটার সময়ে গানের পালা সাঙ্গো হ'লো— সঙ্গে সঙ্গে খাঁ-সাহেব যেন জাগ্রত হয়ে ন'ড়ে চ'ড়ে ভালো ক'রে বসলেন। আবরণের ভিতর থেকে বেরুলো তাঁর সযত্নে রক্ষিত ও সজ্জিত শরদ। একে একে বাঁধা হ'ল তার। যন্ত্রটিকে বাগিয়ে ধ'রে তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, তাঁর মুখমণ্ডল শিল্পীসুলভ প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। এতক্ষণ তাঁকে দেখাচ্ছিল সাধারণ মানুষের মত, বীণা হাতে তুলে নিতেই তিনি হয়ে উঠলেন ব্যক্তিত্বে অসাধারণ। তারপর সুরু হ'ল বাজনা।

সেদিন বীণার যে ভাষা শুনলুম, তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। কলমের রেখা মৌন, সঙ্গীত হচ্ছে ধ্বনিময়। কলম দিয়ে

আঁকা যায় বড়-জোর শব্দছবি, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বিচিত্র বিভিন্ন তালে ছন্দোময়, বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত সেই মুখর বীণার জীবন্ত ভাষাকে যথাযথরূপে ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা কোন লেখকের আছে ব'লে মানি না।

প্রায় মধ্যরাত্রে বীণা হ'ল নীরব। এতক্ষণ সবাই তুনিয়াকে ভুলে বিচরণ করছিলুম সুরের স্বর্গে, হঠাৎ আবার ফিরে এলুম মাটির পৃথিবীতে। খাঁ-সাহেবের উপরে এতটা শ্রদ্ধা হ'ল যে কোন-রকম মৌখিক প্রশস্তি জানাবার চেষ্টা করলুম না। শ্রেষ্ঠ আর্ট মানুষকে মুগ্ধ করে, মৌন করে, অভিভূত করে; প্রকৃত শিল্পীর পক্ষে তাইই হচ্ছে যথার্থ অভিনন্দন। ভালো অভিনয় দেখে, ভালো সঙ্গীত শুনে যারা হাততালি বা চেঁচিয়ে বাহবা দেয়, আমি তাদের অরসিক ব'লে মনে করি। হাততালি ও হট্টগোল ফুটবল-খেলার মাঠেই শোভা পায়।

তারপরও খাঁ-সাহেবের বাজনা আবার শুনেছি এবং আবার অভিভূত হয়েছি। তাঁর বীণা প্রতিদিনই বলত নূতন নূতন কাহিনী; প্রতিদিনই আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকত নব নব বিস্ময়। খাঁ-সাহেবের পরে কলকাতায় আরো কত ডাকসাইটে শরদ-বাজিয়ে এলেন-গেলেন, তাঁদেরও অনেকের বাজনা শুনেছি। তাঁদেরও তাললয়তুরস্ত নিপুণ হাত, তাঁরাও সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য বিলি করতে কুণ্ঠিত নন, কিন্তু করমতুল্লা খাঁ-সাহেবের বীণায় যে কল্পনার বিলাস থাকত, যে মাধুর্যের আবেদন থাকত, যে অভাবিত কারু-কুশলতা থাকত, আর কারুর কাছ থেকে তা লাভ করি নি আজ পর্যন্ত। উপভোগের দিক দিয়ে বলতে পারি, তিনি ছিলেন বীণকারদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বীণকার।

তাঁর বাসাতেও গিয়েছি অনেকবার আলাপ করতে। যদিও

তিনি বাংলা জানতেন না, তাঁর ভাষা বুঝতেও আমার কিছু কিছু কষ্ট হ'ত, তবু তাঁর সংলাপ শুনে ও শিল্পীজনোচিত মনোবৃত্তি দেখে অতিশয় আনন্দ অনুভব করতুম। তিনি ছিলেন যেমন সদালাপী, তেমনি নিরহঙ্কার এবং বিনয়ী। শিল্পীরাও যে লেখাপড়ায় পণ্ডিত না হয়েও সংস্কৃতি ও আভিজাত্য প্রকাশ করতে পারেন— যার মূল্য কাঞ্চন-কৌলীন্যের চেয়ে অনেক বেশী, তাঁকে দেখলেই পাওয়া যেত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অভ্যাগতদের তিনি আদর করতেও জানতেন। একবার বক্‌রীদের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, তিনি জোর ক'রে আমাকে মাংস খাইয়ে দিলেন। সে মোগলাই মাংসের প্রত্যেক খণ্ডের আকার হাতের চেটোর মতন মস্ত এবং অসম্ভব রকম ঘৃতপক্ক ও মসলাজর্জরিত। তা খেতে খুব স্বাদু বটে, কিন্তু উদরপ্রদেশে অবতরণ ক'রে পরে কোন্ উৎপাত উৎপাদন করবে, সেই ভয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ীতে ফিরতে হয়েছিল।

যদিও তিনি বীণকার, তবু ভারতীয় উচ্চসঙ্গীতের উপরে ছিল তাঁর অবাধ অধিকার। অথচ এ বিষয় নিয়ে অধিকাংশ প্রখ্যাত ওস্তাদের মত তাঁকে কোনদিন তুচ্ছ গর্বপ্রকাশ ক'রে হাস্যাস্পদ হ'তে দেখি নি। নামজাদা গায়করাও তাঁর কাছে তালিম গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হ'তেন না— যেমন অন্ধ-গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে।

এমন একজন অতুলনীয় কলাবিদ্, কিন্তু এই জনবিপুল ও ধনবিপুল কলকাতা নগরে ব'সে তাঁকে ভোগ করতে হ'ত নিদারুণ অর্থ-কষ্ট। পাশ্চাত্য দেশে সামান্য শিস্ দিয়েও লোকে ধনবান হয়, কিন্তু এদেশে জন্মগ্রহণ ক'রে তাঁর মত কালোয়াত অন্ন-বস্ত্র সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি!

আর এক নতুন বৈঠকেও প্রায়ই তাঁর দেখা পেতুম। সেখানে বৈঠকধারী ছিলেন 'লাইট-হেভি-ওয়েটে' পৃথিবী-জয়ী কুস্তিগীর,

বাংলার গৌরব শ্রীযতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবু। সেখানেও যখন-তখন বসত গান-বাজনার আসর। আগে জমীরুদ্দীন খাঁ-সাহেব (ইনিও মস্তবড় গুণী এবং এঁর কথাও পরে বলব) ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতির গান হ'ত, তারপর খাঁ-সাহেব বার করতেন তাঁর মোহনীয়া বীণা। একদিন গানের পর আরম্ভ হ'ল খাঁ-সাহেবের সাধের বীণার হাসি-কান্নার অভিযান, সুর-তরঙ্গের মধ্যে ফুলের মত ভেসে ভেসে উঠতে লাগল নব-রসের সব রস। চিত্রার্পিতের মত ব'সে শুনতে শুনতে হঠাৎ দেখা গেল বেজে গিয়েছে রাত বারোটা। বাড়ীর কথা ভেবে খাঁ-সাহেবকে সেলাম ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম— সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে খাঁ-সাহেব বাজনা থামিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ বিপুলবপু নিয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে একখানা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধ'রে ফেলে ব'লে উঠলেন, 'কোথায় যাবেন বাবুজী ? বাজনা শেষ না হ'লে এখান থেকে যেতে পারবেন না !' বুঝলুম (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বুঝলুম), ফুলের যেমন গন্ধ বিলিয়ে সুখ, সত্যিকার কলাবিদ্‌ও তেমনি নিজের পরিপূর্ণতা না দেখিয়ে তৃপ্তি লাভ করেন না ! বাধ্য হয়ে ব'সে পড়লুম, কারণ শিল্পীর মনে আঘাত দেওয়া পাপ। আবার বীণা তার বিচিত্র ভাষায় আলাপ করতে লাগল এবং সেই অপূর্ব আলাপ যখন বন্ধ হ'ল রাত কাবার হ'তে আর দেরি নেই তখন।

সর্বশেষে খাঁ-সাহেবের একটি মজার গল্প শুনিয়ে রাখি— গল্পটি শুনেছিলুম আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মুখে। তিনি তখন খাঁ-সাহেবের কাছে সেতার বাজনা শিখতে যেতেন।

খাঁ-সাহেব এক নূতন ও ভৌতিক বাসায় উঠে এসেছেন। সে বাসায় আমিও মাঝে মাঝে গিয়েছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য ক্রমে ভৌতিক কোন-কিছুর দ্বারাই আমি বিস্মিত বা

চমকিত হই নি। ভূত সেখানে দেখা দেয় না বটে, কিন্তু অত্যন্ত অভদ্রের মত ইঁট-পাটকেল ছোঁড়ে। বাইরে মুক্তস্থানে নয়, বন্ধ ঘরের ভিতরে! কোন রকমেই এই অশান্তিকর উপদ্রব বন্ধ করতে না পেরে খাঁ-সাহেব শেষটা এক মোক্ষম উপায় অবলম্বন করলেন। কয়েক খণ্ড কাগজে পবিত্র কোরাণের বয়েৎ বা শ্লোক লিখে তিনি ঘরের সব জানালা বন্ধ ক'রে দেওয়ালের নানাস্থানে টাঙিয়ে দিয়ে প্রেমাঙ্কুর প্রমুখ সাকরেদদের ডেকে বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই ঐ এক-একখানা কাগজের তলায় গিয়ে বোসো। ভূতের জারিজুরি আজ আর খাটবে না।'

প্রেমাঙ্কুর বলেন, 'খানিকক্ষণ যেতে-না-যেতেই আবার সেই ইষ্টকপাত সুরু হ'ল। কোথা থেকে কি হচ্ছে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু বোঁ-বোঁ ক'রে এর-ওর-তার এপাশ-ওপাশ দিয়ে ছুটে আসতে লাগল ইঁট এবং পাটকেল।'

অবশেষে খাঁ-সাহেব নাচার ভাবে হতাশ হয়ে দুঃখিত স্বরে অদৃশ্য প্রেতের উদ্দেশে বললেন, 'এ কেয়া হায়? রূপেয়া ফেকো বাবা, রূপেয়া ফেকো!'

বোধ করি সে অবিশ্বাসী কাফের ভূত, কোরাণের পবিত্র বয়েৎ মানে না, তাই ইঁট-পাটকেলের বদলে টাকা নিক্ষেপ করতে রাজি হ'ল না।

অতএব সেই বিপদজনক বাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন খাঁ-সাহেব।

আট

সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে—এমন কি অভিনয়েও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের দান অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ না করলেও বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকত ঠাকুর-পরিবারের বিস্ময়কর অবদান। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ওখানে আরো যে কয়জন কৃতী মানুষ দেখা দিয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী। বাংলা দেশের যে কোন পরিবার এতগুলি শক্তিধরকে লাভ করতে পারলে চিরস্মরণীয় হ'তে পারত।

১৩৪৪ সালের শেষের দিকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরেই গগনেন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেশব্যাপী সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল এবং ছোট বড় প্রত্যেক পত্রিকায় দেখা গিয়েছিল তাঁর সাহিত্যসাধনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা। কিন্তু শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কোন সাময়িক পত্রিকাতেই তাঁর আর্ট নিয়ে বিশিষ্ট আলোচনা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। এর কারণ কি বাঙালী লেখক ও পত্রিকাওয়ালাদের চিত্রকলা সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতা? না চিত্রকলার প্রতি অবহেলা? অথচ সূক্ষ্মবিচারে প্রমাণিত হবে, সাহিত্যে ও চিত্রকলায় যথাক্রমে শরৎচন্দ্রের ও গগনেন্দ্রনাথের প্রতিভা হচ্ছে তুল্যমূল্য।

গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন তুলি-কলমের ঐন্দ্রজালিক অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর। কনিষ্ঠের মত তাঁরও প্রাচ্য চিত্রকলা-পদ্ধতির উপর

শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট এবং ঐ পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে তিনিও তুলিকা-চালনা ক'রে উচ্চশ্রেণীর নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীন মন কোন এক বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় নি। চেষ্টা করলে তাঁর হাতের কাজের ভিতর থেকে জাপানী, চৈনিক ও য়ুরোপীয় প্রভাবও আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি যেখান থেকে যা-কিছু গ্রহণ ক'রেছেন, দেশী ছাঁচে ঢেলে একেবারে নিজের ক'রে নিতে পেরেছেন। বিলাতী চিত্রকর হুইস্‌লারের ('আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' মন্ত্রের উদ্ভাবক) উপরে পড়েছিল জাপানী প্রভাব, কিন্তু তাঁর ছবি হ'ত য়ুরোপীয় ছবিই।

গগনেন্দ্রনাথ 'কিউবিজম্' নিয়ে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। য়ুরোপীয় আর্টে 'কিউবিজম্' অনেক সময়ে যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গের মত হয়ে ওঠে। কিন্তু 'কিউবিষ্ট'দের পদ্ধতি তিনি এমন সংযত ও যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেছেন যে, তাঁর ছবিগুলি কেবল বাংলার উপযোগী হয়েই ওঠে নি, সেইসঙ্গে প্রকাশ করেছে বিচিত্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যও। ডক্টর এইচ কজিনসও স্বীকার করেছেন, 'য়ুরোপের 'কিউবিষ্ট'রাও এমন চমৎকার ছবি আঁকতে পারে না।'

বাংলা চিত্রকলায় তাঁর একটি অভিনব দান হচ্ছে, সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ চিত্রকর হোগার্থের মত তিনিও নিজের সমাজের অবিচার ও ব্যভিচার প্রভৃতি নিয়ে অনেকগুলি অসাধারণ ছবি এঁকে গিয়েছেন, তার প্রত্যেকখানি শিল্পীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, মুক্ত মন, গভীর চিন্তাশীলতা ও রসমধুর কল্পনার পরিচয় দেয়। প্রত্যেক ছবিতেই পটুয়ার তুলি যে গল্প বলতে চেয়েছে, কোন সেরা লেখকের কলমও তা আরো ভালো ক'রে ফোটাতে পারত না। কেবল বিষয়বস্তুর জন্যে নয়, রেখার খেলার জন্যেও ছবিগুলিকে অনন্যসাধারণ বলতে পারি। এক-একটি তুলির টান

যেন রেখায় লেখা এক-একটি কবিতা। শেষোক্ত বিশেষত্বটি গগনেন্দ্রনাথের যে কোন চিত্রে বর্তমান। তিনি ছিলেন যথার্থ কবি-মনের অধিকারী।

অনেক বছর আগেকার কথা। কিছুকাল গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে গিয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলুম। সেই সময়ে স্কুল-বাড়ীর উপর-তলায় প্রাচ্য চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী খোলা হয়। সেখানে দেখানো হয় প্রাচীন ও আধুনিক দুই রকম ছবিই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিত্রের মধ্যে প্রথম যে যে পার্থক্য চোখে পড়ল তা হচ্ছে এই: বিলাতী ছবি দেখাতে চায় রঙের ঘটা এবং দেশী ছবিতে পাওয়া যায় রেখার সমারোহ। এবং বিলাতী শিল্পীরা হচ্ছেন প্রকৃতির অনুকারী, আর দেশী শিল্পীরা প্রতিকূল না হ'লেও অনুকারী নন।

বিলাতী পদ্ধতিতে শিক্ষিত এক শিল্পী বন্ধুর সঙ্গে প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখছিলুম। একখানি প্রাচীন চিত্র দেখতে দেখতে আমাদের দুজনের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। বন্ধু সে ছবির ভিতরে দেখবার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না। আমি চিত্রকরের সূক্ষ্ম তুলির কাজের প্রশংসা করছিলুম। সেই সময়ে একজন প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক আমাদের পিছনে। মুখ টিপে হাসতে হাসতে তিনি আমাদের তর্কাতর্কি শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'এই ছবিখানির একটা বিশেষত্ব দেখবেন?' তাঁর হাতে ছিল একখানা আতশী-কাঁচ, সেখানা তিনি ছবির উপরে ধরলেন। যা দেখলুম, বিস্ময়কর! ছবিখানি খুব ছোট। ছবির মূর্তি আরো ছোট— দুই ইঞ্চির বেশী বড় হবে না। কিন্তু অতটুকু মূর্তির মাথার চুলগুলি আঁকতে ব'সে পটুয়া কেবল খানিকটা কালো রং বুলিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হন নি, একমনে ব'সে ব'সে সযত্নে প্রত্যেক চুলগাছি

আলাদা আলাদা ক'রে এঁকেছেন! সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য নগ্ন চক্ষে ধরা পড়ে না! বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকররা অতি সূক্ষ্ম কাজ করতেন যে-রকম তুলি নিয়ে, তাতে থাকত কেবল কাঠবিড়ালের একগাছি চুল! অবাক হয়ে দুই বন্ধুতে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর ফিরে দেখি, সেই ভদ্রলোক আর একদল দর্শকের কাছে গিয়ে সকলকে আর এক খানা ছবির বিশেষত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করবার জন্যে যাঁর এতটা আগ্রহ, তাঁর নাম জানবার জন্যে মনে জাগল কৌতূহল। শুনলুম তাঁর নাম গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেই দিনই প্রদর্শনীতে তাঁর হাতে আঁকা ছবি দেখি সর্বপ্রথমে। মনের মধ্যে আজও জেগে আছে তার সবুজ স্মৃতি। একরত্তি ছবি, তারও সব জায়গায় পড়েনি চিত্রকরের তুলির স্পর্শ। পদ্মানদীর চরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক নারীমূর্তি— শ্বেত বসন, কাঁকালে কলসী। সামান্য বিষয়বস্তু, মাত্র গুটিকয় রেখা, কিন্তু তার মধ্যেই পাওয়া গেল অসামান্য ও ইঙ্গিতময় সৌন্দর্যের আশ্চর্য মাধুর্য। একাধারে রেখাচিত্র এবং রেখাকাব্য।

ঠাকুরবাড়ীতে সর্বপ্রথমে "ফাল্গুনী"র যে অভিনয় আয়োজন হয়, সেখানে চিত্রকর গগনেন্দ্রনাথকে দেখেছিলুম অভিনেতারূপে। তাঁর নাট্যানুরাগও বংশানুক্রমে লব্ধ। বাংলাদেশে প্রথমে যে কয়টি নাট্য-প্রতিষ্ঠান নাট্যকলাচর্চার সূত্রপাত করেছিল, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা তাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। সেখানে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('বাবুবিলাস' নাটক প্রণেতা), গুণেন্দ্র-নাথ ঠাকুর এবং নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রভৃতির চেষ্টায় অভিনয়ের আসর বসত। গগনেন্দ্রনাথও যে সখ ক'রে তাঁদের অনুগামী হবেন, এ হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যাপার। কেবল

তিনি নন, তাঁর আর দুই সহোদরও (সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ) রঙ্গমঞ্চের উপরে আবির্ভূত হয়েছেন।

"ফাল্গুনী" পালায় গগনেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন রাজার ভূমিকা। রঙ্গমঞ্চের উপরে রাজা সেজে আরো কত লোককেই নামতে দেখেছি, কিন্তু সকলকেই নকল রাজা ব'লে মনে হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দেখিয়েছিলেন সত্যিকার রাজাকে। তাঁর চলা-ফেরা, ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা সমস্তই হয়েছিল রীতিমত রাজমহিমাব্যঞ্জক। যেমন তাঁকে মানিয়েছিল, তেমনি তাঁর অভিনয়ও হয়েছিল চমৎকার। তারপরেও অন্য পালায় তাঁর নাট্য-নৈপুণ্য দেখে বেশ বুঝতে পেরেছি, তিনি ছিলেন একজন উচ্চ-শ্রেণীর অভিনেতা।

গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছি ঠাকুর-বাড়ীর বহু বৈঠকেই। মাঝে মাঝে আর্ট ও সাহিত্য নিয়েও তাঁর সঙ্গে করেছি অল্পস্বল্প আলোচনা। একদিন 'কিউবিজ্‌মে'র প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'য়ুরোপের 'কিউবিষ্ট'রা সকলকে অবাক ক'রে দেবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু তাঁদের পদ্ধতি একেবারে নতুন কিছু নয়। অজন্তার ছবি তো কতকাল আগেকার জিনিষ, কিন্তু যার চোখ আছে সে অজন্তার চিত্রাবলীর মধ্যেও স্থানে স্থানে 'কিউবিজ্‌ম্'কে খুঁজে বার করতে পারবে।'

তিনি হাস্যরঞ্জিত মুখে শিষ্ট ও মিষ্ট ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ করতেন বটে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মতন মজলিসী মানুষ ছিলেন না। তাঁর হাবভাবে একটা আভিজাত্যের ভাবও থাকত, জনতার ভিতরেও তিনি নিজেকে আলাদা ক'রে রাখতে পারতেন। রবীন্দ্র-নাথের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "বিচিত্রা"র সাপ্তাহিক আলোচনা-সভায় কোন দিনই তাঁকে অনুপস্থিত দেখি নি, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি

থাকতেন নির্বাক শ্রোতা হয়ে। কেবল অভিনয়ের আয়োজন হ'লে অংশ গ্রহণ করতেন।

তাঁর সদাশয়তা ও গুণগ্রাহিতার একটি দৃষ্টান্ত জানি। পৃষ্ঠদেশে দারিদ্র্যের ভার নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম জীবনে যখন একান্ত-ভাবে সাহিত্যসাধনায় নিযুক্ত হয়ে আছেন, তখন তিনি নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কেটে গিয়েছে দারুণ এক ট্রাজেডির ভিতর দিয়ে। দেহ লোপ পাবার আগেই মৃত্যু হয়েছিল শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের। শেষ জীবনে তিনি পক্ষাঘাত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে চোখে দেখলে কিছু বোঝবার যো ছিল না, দেহ যেন স্বাস্থ্যসুন্দর— চলছেন, ফিরছেন, হাসছেন, গাড়ীতে চ'ড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। কিন্তু কথা কইতেও পারতেন না, ছবি আঁকতেও পারতেন না।

তাঁর পুত্র শ্রীকনকেন্দ্রনাথ একদিন বললেন, 'বাবার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তাঁর কোন খাবার খেতে ইচ্ছে হয়েছে। কি খেতে চান সেটা তিনি বার বার লিখে জানাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু লিখতে পারছেন না।'

তাঁর সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা হয়, সেদিনের কথাও ভুলি নি। দোতলার বৈঠকখানায় অবনীন্দ্রনাথের কাছে ব'সে আছি আমরা কয় বন্ধু। এ কথা সে কথা হচ্ছে। এমন সময়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন গগনেন্দ্রনাথ। দেখলে কিছুতেই সন্দেহ হয় না যে তাঁর দেহের মধ্যে বাস করছে জীবন্ত মৃত্যু। চিত্রশিল্পী চারু রায় ও আমি গাত্রোত্থান ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলুম। আমাদের দেখে তাঁর সৌম্য মুখ প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তিনিও সাগ্রহে আমাদের কি বলতে উদ্যত হলেন, কিন্তু কিছুই বলতে

পারলেন না,— কেবল তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হ'ল একটা অব্যক্ত শব্দ।

ব্যাধি ও বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথেরও শেষ জীবন দুঃখময় হয়ে উঠেছে। কেবল ব্যাধি ও বার্ধক্যের দুঃখ নয়, সৃষ্টি করতে না পারার দুঃখ। সেদিন আমাকে দেখে বললেন, 'হেমেন্দ্র, বড় কষ্ট! লিখতে চাই, আঁকতে চাই, কিন্তু লিখতেও পারি না, আঁকতেও পারি না।"

শিল্পীর পক্ষে এ হচ্ছে চরম ট্রাজেডি। এই ট্রাজেডির দুঃখ ভোগ করতে করতেই গগনেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করতে হয়েছিল মর্তধাম।

নয়

বাংলা সাহিত্যে গত যুগের ছোটগল্পে প্রভাতকুমারের স্থান রবীন্দ্রনাথের পরেই। মাসিক-সাহিত্য এদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে গত শতাব্দীর উত্তরার্ধে। এখনকার মতন তখন ঢাউস ঢাউস পত্রিকা প্রকাশিত হত না, তখনকার "ভারতী" ও "সাহিত্য" প্রভৃতি আকারে ডাগর পত্রিকাগুলি আজকের মাসিক কাগজগুলির বিরাট কলেবরের পাশে উল্লেখযোগ্য ব'লেই বিবেচিত হবে না। সেই সময়ে "দাসী" নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত আকারে যা "ভারতী" ও "সাহিত্য" প্রভৃতির চেয়েও ছোট ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকরূপে দেখা দেন প্রথম সেই "দাসী" নিয়েই।

বাল্যকালে একসঙ্গে এক বছরের "দাসী" আমার হাতে পড়ে। তার মধ্যে দেখলুম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা, "স্বর্ণলতা" প্রণেতা তারকনাথের জীবনী ও "একটি রৌপ্য- মুদ্রার জীবনচরিত" নামক গল্প। সেইগুলি পাঠ করে প্রভাতকুমারের গুণপনার সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হই এবং "একটি রৌপ্য-মুদ্রার জীবনচরিত"ই বোধ করি প্রভাতকুমারের লেখা প্রথম গল্প। "দাসী"র আর একজন নিয়মিত লেখক এখনো লেখনী ত্যাগ করেন নি। তিনি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

তারপর "প্রদীপ" ও "ভারতী" পত্রে প্রভাতকুমারের আরো অনেক গল্প পাঠ করলুম এবং তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়লুম। মাসিক-সাহিত্যসমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে লাগল।

এবং হঠাৎ শুনলুম এক "রোমান্সে"র কাহিনী। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্যাবতী ও লেখিকা কন্যা সরলা দেবী প্রভাতকুমারের গল্প পাঠ করে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছেন, শীঘ্রই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন। প্রভাতকুমার তখন বোধহয় ডাক-বিভাগে কেরাণীগিরি করতেন। নিজেদের পরিবারের যোগ্য ক'রে নেবার জন্যে সরলা দেবীর মাতা-পিতা প্রভাতকুমারকে বিলাতে পাঠাতে চাইলেন। তিনিও চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিলাতে যাত্রা করলেন ব্যারিষ্টারি শেখবার জন্যে।

এ-রকম 'রোমান্স' বাংলা সাহিত্যসমাজে বড় একটা ঘটে না, সহরের সাহিত্যবৈঠকগুলি কিছুদিন পর্যন্ত সরগরম হয়ে রইল। দেখতে দেখতে তিন চার বৎসর কেটে গেল। প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরলেন। কিন্তু এরি মধ্যে ব্যাপারটা কি ঘটল ঠিক বোঝা যায় নি, তবে সরলা দেবীর সঙ্গে প্রভাতকুমারের বিবাহ আর হ'ল না! চোখের আড়াল হ'লে প্রাণের আড়াল হয়— বোধ করি সত্য হয়ে দাঁড়াল এই প্রবাদটাই।

প্রভাতকুমার প্রথমে রংপুরে ও তারপরে গয়ায় গিয়ে কিছুকাল ব্যারিষ্টারি করলেন, তারপর কলকাতায় এসে হ'লেন ল কলেজের অধ্যাপক। সরলা দেবী কিছুকাল "ভারতী" সম্পাদনা ক'রে সাহিত্য-চর্চ্চা প্রায় ছেড়ে দিয়ে পাঞ্জাবে গিয়ে হ'লেন রামভুজ দত্ত-চৌধুরীর সহধর্মিণী। প্রভাতকুমার কিন্তু সাহিত্য-সাধনা ছাড়লেন না। প্রথমে "প্রবাসী" এবং তারপর অন্যান্য পত্রিকার জন্যে গল্প ও উপন্যাস রচনা করতে লাগলেন। অবশেষে গ্রহণ করলেন "মানসী ও মর্মবাণী"র সম্পাদনার ভার।

প্রভাতকুমারের গল্পগুলি প্রধানত আখ্যানবস্তু এবং কৌতুক-কর ঘটনা ও বর্ণনার জন্যে সর্বশ্রেণীর পাঠকদের আকর্ষণ করে।

তাঁর ভাষায় প্রসাদগুণ আছে যথেষ্ট, কিন্তু তিনি মার্জিত ও অসাধারণ রচনারীতি ব্যবহার করেন নি, ভাষাকে নানারূপ সুনির্বাচিত অলঙ্কার দিয়েও সাজাতে যান নি। তবে কৌতুক ও হালকা ভাবের সাহায্যে তিনি যে জীবনের গুরুতর সমস্যার ইঙ্গিতও দিতে পারেন, "প্রবাসী" পত্রিকায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ("ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর" প্রবন্ধে)।

"ভারতবর্ষ" প্রকাশের কিছুকাল পরে স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদকতায় "সঙ্কল্প" নামে একখানি স্বল্পজীবী সুবৃহৎ পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আমি তার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতুম। যদিও তখনো আমি গ্রন্থকার হইনি, তবে গল্পলেখকরূপে মাসিক সাহিত্যে কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করেছি। সেই সময়ে খবর পেলুম, হেদোর ধারে "মানসী"র কার্যাধ্যক্ষ সুবোধচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে এসে উঠেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এতদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পাই নি, সুতরাং এ সুযোগ ছাড়লুম না। কিছু কাল আমিও "মানসীর" দলভুক্ত ছিলুম, সুবোধবাবু আমার বন্ধু, তাই অসঙ্কোচেই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম।

একতালার বৈঠকখানায় ব'সে ছিলেন প্রভাতকুমার। দীর্ঘ দেহ, কৃষ্ণ বর্ণ, দাড়ী-গোঁফ কামানো মুখ, শান্ত দৃষ্টি, দোহারা ভারিক্কে চেহারা। বয়সে প্রৌঢ়।

প্রণাম করলুম। সুবোধবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রভাত-কুমার মৃদুমধুর হেসে বললেন, ' "সঙ্কল্পে" আপনার 'কপোতী' গল্পটি আমি পড়েছি। আমার ভালো লেগেছে।'

তাঁর মত গুণী লেখকের মুখে সুখ্যাতি শুনে যে খুসি হয়েছিলুম

সে কথা বলা বাহুল্য। বললুম, 'আগে আপনি কবিতা লিখতেন। আর লেখেন না কেন ?'

—'কবিতা আর আসে না।'

সেদিন কিন্তু ভালো ক'রে আলাপ জমল না। আমি আরো দু-একটা প্রশ্ন করলুম, তিনি খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। তাঁর গাম্ভীর্য দেখে আমি আর বেশী কথা কইতে ভরসা করলুম না।

কয়েক মাস পরে "সংকল্প" উঠে গেল। খুব ঘটা ক'রে "ভারতবর্ষে"র সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্যে "সঙ্কল্পে"র জন্ম হয়েছিল। গুণে সে "ভারতবর্ষে"র চেয়ে খাটো ছিল না, কিন্তু অর্থবল না থাকলে প্রতিযোগিতা সফল হয় না। তারপরেই নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় "মর্মবাণী" নামে একখানি সাহিত্য সম্পর্কীয় সপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আমি ছিলুম তার সহকারী সম্পাদক। আসলে সম্পাদকীয় সমস্ত কর্তব্য পালন করতে হ'ত আমাকেই। কারণ কাগজখানি প্রকাশিত হবার অল্পদিন পরেই মহারাজা দীর্ঘ-কালের জন্যে বিদেশে চ'লে গিয়েছিলেন এবং অমূল্যবাবু নানা কার্যে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন, সম্পাদকীয় কাজে মনোনিবেশ করবার অবসর বড় একটা পেতেন না। পত্রিকাখানির আরম্ভ হয়েছিল আশা-প্রদ। কিন্তু হঠাৎ বাধে পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ, কাগজের ও অন্যান্য জিনিষের দাম বেড়ে ওঠে, লাভের চেয়ে লোকসানই হ'তে থাকে বেশী। প্রায় বৎসর খানেক নিজের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে "মর্মবাণী" পরে "মানসী"র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই "মর্মবাণী"র সময়েই আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ "পসরা" প্রকাশিত হয়।

প্রভাতকুমার সে সময়ে গয়ায় থাকতেন। আমি তাঁর কাছে তাঁর কবিতা রচনার কথা তুলেছিলাম ব'লে কিংবা নাটোরের

মহারাজার অনুরোধে তিনি "মর্মবাণী"র জন্যে যে দীর্ঘ রচনাটি পাঠালেন তার নাম "সূক্ষ্মলোম পরিণয়"। সেটি হচ্ছে কৌতুক-নাটিকা এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। জন্তুরা হচ্ছে তার পাত্র-পাত্রী, নায়ক ও নায়িকা হচ্ছে ভল্লুক ও ভল্লুকী। জন্তুদের নিয়ে তার আগে বাংলা ভাষায় আর কোন নাটক বা উপন্যাস রচিত হয় নি। রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ুয়াদের চমৎকৃত করেছিল। সকলের মুখেই শুনেছি তার সুখ্যাতি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এমন মনোজ্ঞ রচনাও আজ পর্যন্ত "মর্মবাণী"র পৃষ্ঠার মধ্যেই নিদ্রিত হয়ে আছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

সেই সময়েই প্রভাতকুমারের সঙ্গে একাধিকবার পত্রালাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আবার আমার চোখোচোখি দেখা হয় অনেক বৎসর পরে, প্রভাতকুমার যখন কলকাতায় এলেন তখন। তাও মাঝে মাঝে। তিনি অভিনয়ের অনুরাগী ছিলেন, মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর সঙ্গে দেখাশুনো হ'ত— কিন্তু ঐ পর্যন্ত। যদিও তখন আমি আর বয়সে কাঁচা বা নাবালক নই, দস্তুরমত পুত্র-কন্যার পিতা, তবু তাঁর পরম গম্ভীর মুখ দেখে দূর থেকেই প্রণাম ক'রে আমি স'রে পড়তুম, সাহস সঞ্চয় ক'রে আলাপ জমাতে পারতুম না।

আমি তখন 'নাচঘরে'র সম্পাদক। "ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস" নামক চলচ্চিত্র সম্প্রদায় প্রভাতকুমারের "নিষিদ্ধ ফল" নামে গল্প অবলম্বন ক'রে একখানি নির্বাক ছবি তুললে এবং তাদের বাঘমারির ষ্টুডিওয় ছবিখানি সর্বপ্রথমে দেখবার জন্যে আমন্ত্রিত হলুম। সেইখানেই আবার প্রভাতকুমারের সঙ্গে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে ভালো ক'রে কথা কইবার সুযোগ পেলুম। চিত্র-প্রদর্শনী শেষ হ'ল। শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় তোলা সেই ছবিখানি

আমারও ভালো লাগল এবং পরে জনসাধারণও তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল।

একই মোটরে প্রভাতকুমারের সঙ্গে ফিরে আসছি, হঠাৎ তিনি আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

—'বাড়ীতে।'

—'নিশ্চয়ই নয়। আজ আপনাকে আমার ওখানে গিয়েই রাত্রের ডান হাতের ব্যাপারটা সম্পন্ন করতে হবে। যদি আপত্তি করেন সে আপত্তি মানব না।'

সহসা এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনে এতই বিস্মিত হলুম যে, কোন আপত্তিই করতে পারলুম না। নীরবে তাঁর সঙ্গে গাড়ী থেকে নামলুম এবং সেইদিনই সর্বপ্রথমে লাভ করলুম আসল প্রভাতকুমারের সাহচর্য। খুলে পড়ল তাঁর গাম্ভীর্যের মুখোস, পানাহারের সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করতে করতে তিনি সহচরের মত একেবারে ঘুচিয়ে দিলেন আমাদের বয়সের ব্যবধান। পরে বুঝেছিলুম তিনি মোটেই গম্ভীর নন, একান্ত মুখচোরা মানুষ, নূতন লোক দেখলে সাবধানে নির্বাক হয়ে থাকেন, নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না। এই জন্যেই কেউ তাঁকে কোনদিনই কোন সভায় নিয়ে গিয়ে সভাপতি করতে বা বক্তৃতা দেওয়াতে পারে নি। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত। দ্বিজেন্দ্রলালকেও আমি কলকাতার কোন সভায় সভাপতি হ'তেও দেখি নি, বক্তৃতা দিতেও শুনি নি। একবার আমি তাঁকে একটি সভায় হাজির থাকতে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু নির্বাক শ্রোতারূপে।

তারপর কত সন্ধ্যা আমার প্রভাতকুমারের সঙ্গে কেটে গিয়েছে কত আনন্দে তার আর সংখ্যাই হয় না। এক একদিন তাঁর

আসরে এসে হাজির হ'তেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ সুধীবৃন্দ, সে সব দিনে গল্প করতে করতে আমাদের আর হুঁশ থাকত না যে, বেজে গিয়েছে কখন রাত বারোটা। প্রভাতকুমার যখন মন খুলতেন, একেবারে মজলিসী লোক হয়ে উঠতেন। আর কতরকম গল্পই তিনি জানতেন! সাহিত্যের গল্প, অন্যান্য চারুকলার গল্প, বিলাতের গল্প, সাধারণ খোসগল্প। তার উপরে পরম স্নেহভরে সকলকে খাওয়ানো-দাওয়ানো, আদর-আপ্যায়ন। তাও অল্প উপভোগ্য ছিল না। এক-একদিন আলাপ করতে করতে রাত্রি এমন গভীর হয়ে উঠত যে, তিনি আমাকে বাড়ীতে ফিরতে দিতেন না। সেদিন তাঁর সঙ্গেই এক শয্যায় শয়ন ক'রে কাবার হয়ে যেত বাকি রাত্রিটা। এখন সেই সব কথা মনে করি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি— হায়, সাহিত্যজগতে আর প্রভাতকুমারের মতন মানুষ নেই, সে সব সুখের দিন আর ফিরে আসবে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রসঙ্গে ব'লেছিলুম, তাঁর সঙ্গে আমার শেষ-দেখা হয়েছিল বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট আর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সংযোগস্থলে। তারপরেই পেয়েছিলুম সন্ন্যাস রোগে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ। একদিন বৈকালে ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম চলন্ত ট্রামে ব'সে আছেন প্রভাতকুমার। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি একটুখানি হাসলেন। তারপর সেই সন্ধ্যাতেই তিনি সন্ন্যাস রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন শুনে তাড়াতাড়ি তাঁকে দেখতে গেলুম। আমি আর একবার তাঁকে দেখলুম বটে, কিন্তু প্রভাতকুমার আমাকে দেখতে পেলেন না। তিনি তখন মূর্চ্ছিত। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙে নি।

আমার মুখে ঐ দুটি কাহিনী শুনে বিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয়

নির্মলেন্দু লাহিড়ী একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'ভাই হেমেন্দ্র, আমিও ঐ রোগে ভুগছি। তাই ট্রামে চড়ে যেদিন বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে আসি, ভয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নি। কি জানি বাবা, যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!'

দশ

যাঁদের দেখেছি, লিখতে বসেছি তাঁদের কথা। আমার স্মৃতির জগতে আজ স্বর্গীয় মানুষদের জনতা। তাঁদের সকলকার কথা বলতে গেলে কথা আর ফুরুবে না এবং সকলকার কথা বলবার মত নয়ও। সাহিত্য ও আর্টের ক্ষেত্রে যে সব অসামান্য মানুষ আমার মনের পটে বিশেষ রেখাপাত করেছেন, আমি দেখাতে চাই কেবল তাঁদেরই কয়েকজনকে।

অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন এমনি একজন অসামান্য মানুষ। গত যুগের প্রথম শ্রেণীর নাট্যশিল্পীদের মধ্যে তাঁকে আমি যতবার দেখবার সুযোগ পেয়েছি, ততবার আর কারুকেই নয়। তাঁর সঙ্গে কখনো আমার মৌখিক আলাপ হয় নি, অথচ তিনি ছিলেন আমার শৈশবের বন্ধু! আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয় বৎসর, তখন প্রেক্ষাগারের ত্রিতলে তারের জাল দিয়ে ঘেরা মেয়েদের আসনে মায়ের সঙ্গে ব'সে দেখেছি, গুরুমশাইয়ের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর বেত্র আস্ফালন করতে করতে পাঠশালার ছেলেদের বলছেন,—'পড়্, পড়্, ল্যাখে ল্যাখে পড়্!' সে ছবি আজও আমার মনে ঝাপ্সা হয় নি। অভিনেতার যথার্থ পরিচয় দিতে গেলে চাক্ষুষ পরিচয়ের মূল্যই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। রঙ্গমঞ্চের বাইরে থাকে নটের যে ব্যক্তিগত জীবন, তার কথা এখানে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব'লে অতুলনীয় নাম কিনেছিলেন গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর এবং বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত অভিনেতাই

ছিলেন তাঁদের শিষ্য বা প্রশিষ্য। কিন্তু তাঁদের গুরুর নাম কেউ জানে না। বোধ হয় তাঁরা ছিলেন জন্মনট, গোড়া থেকেই নাট্যকলায় ছিল তাঁদের অশিক্ষিতপটুত্ব। গিরিশচন্দ্রের নটজীবন সুরু হয় ১৮৬৭ কি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, সখের যাত্রার আসরে। অর্দ্ধেন্দুশেখরেরও প্রথম আত্মপ্রকাশ প্রায় ঐ সময়েই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জামাতার ভবনে "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনে তিনি অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের মুখে জানতে পারি, তিনি একলাই অভিনয় করেছিলেন তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায়— পরে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান ক'রেও বহুবার তিনি এই ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মদাস সুরের "আত্মজীবনী" প'ড়ে জানতে পারি, কেবল অভিনেতারূপে নয়, গোড়া থেকেই তিনি কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন অভিনয়-শিক্ষক রূপেও। এরকম ব্যাপার সচরাচর দেখা যায় না।

বালক-বয়সে বুদ্ধি পাকবার আগে আমি তাঁকে যে সব ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখেছি, সেগুলির কথা নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ নেই। তবে সাবালক হ'য়ে তাঁর যে সব ভূমিকার দিকে আকৃষ্ট হয়েছি, সেগুলি হচ্ছে এই : বিদ্যাদিগগজ (দুর্গেশনন্দিনী), যোগেশ ও রমেশ (প্রফুল্ল), কর্তা (জেনানার যুদ্ধ), জলধর (নবীন তপস্বিনী), "সংসার" নাটকের একটি ভূমিকা— নাম মনে হচ্ছে না, রূপচাঁদ (বলিদান), দানসা (সিরাজদ্দৌলা), হলওয়েল ; হে ও মেজর অ্যাডাম্‌স্‌ (মীরকাসিম), হারাধন (য্যায়সা-কা-ত্যায়সা), আবুহোসেন এবং বিয়ে-পাগলা বুড়ো (তুফানী)।

গিরিশচন্দ্রের পুরাতন বন্ধু হ'লেও এক বিষয়ে তিনি তাঁর মত মানতেন না। গিরিশচন্দ্র অভিনয়ে সুর পছন্দ করতেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর পছন্দ করতেন না। তিনি যে সুরবর্জিত অভিনয় করতেন স্বাভাবিকতাই ছিল তার আদর্শ। আমি কোন পৌরাণিক নাটকে

তাঁকে অভিনয় করতে দেখি নি, সুতরাং কেমন ক'রে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন, সে কথা বলতে পারব না। তবে বিনা সুরে যে কবিতা আবৃত্তি করা যায়, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

অভিনেতা আছেন দুই রকম। এক, যিনি নিজের ভূমিকার মধ্যে একেবারে তন্ময় হয়ে ডুবে যান; আর এক, যিনি থাকেন সচেতন, ভূমিকার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে চান না। দুই দলেই বড় বড় অভিনেতাকে দেখা যায়। এদেশে প্রথম দলে ছিলেন অমৃতলাল মিত্র ও দানীবাবু প্রভৃতি। দ্বিতীয় দলে দেখি অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু এবং এ যুগের শিশিরকুমার প্রভৃতিকে।

অধিকাংশ অভিনেতাই বড় বড় ভূমিকার জন্যে লালায়িত হন। কিন্তু বড় বড় ভূমিকাভিনয়ের জন্যে অতুলনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এবং নিজে নাট্যাচার্য হয়েও অর্ধেন্দুশেখর কখনো প্রধান রূপে পরিচিত হ'তে চান নি। প্রায়ই গ্রহণ করতেন ছোট ছোট অবান্তর ভূমিকা এবং প্রায়ই দেখা গিয়েছে তাঁর অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে সেই সব ছোট ছোট ভূমিকাই নাটকের মধ্যে অত্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেছে। "রিজিয়া" পালায় সকলকে নাটকের পাঠ শিখিয়ে এবং এবং বড় বড় ভূমিকাগুলি অন্যান্য পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিলি ক'রে তিনি নিজে নিলেন ঘাতকের ছোট্ট ভূমিকা। কিন্তু তাঁর অভিনয়গুণে সেই ক্ষুদ্র ভূমিকাই এতটা বিখ্যাত হয়ে উঠল যে, পরে শ্রেষ্ঠ নট ছাড়া আর কেউ সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে সাহসী হ'ত না। "প্রতাপাদিত্য" নাটকের রডার ভূমিকাটি আগে আরো ছোট ছিল। পালাটি যখন খোলা হয়, তখন কোন নামজাদা নটই ঐ ভূমিকাটি গ্রহণ করতে রাজি হন নি। অবশেষে রডা সেজে দেখা দিলেন অর্ধেন্দুশেখর নিজেই। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকাটি এমন প্রধান

হয়ে উঠল যে, তারপর থেকে সেরা সেরা অভিনেতারা ঐ ভূমিকাটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতেন এবং রডার লোকপ্রিয়তা দেখে নাট্যকারও ভূমিকার আকার আরো বাড়িয়ে দিলেন।) যখন "ম্যাকবেথ" খোলা হয়, তখন হোমরাচোমরা অভিনেতারা গ্রহণ করলেন ভারি ভারি ভূমিকা। কিন্তু অধিকাংশ হোমরাচোমরাদের মাথার মণি হয়েও অর্ধেন্দুশেখর নিজের জন্যে বেছে নিলেন ক্ষুদে ক্ষুদে পাঁচটি ভূমিকা— প্রথম ডাকিনী, বৃদ্ধ, প্রথম হত্যাকারী, ডাক্তার ও দ্বারপাল।

পাশ্চাত্য নাট্যজগতে নবযুগ এনেছিল জার্মানীর মিনিন্‌জেন নাট্য-সম্প্রদায়— পরে যার আদর্শে গঠিত হয় রুশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটার। সেখানে বড় ও ছোট ভূমিকা ছিল তুল্যমূল্য। অর্ধেন্দুশেখরও নিশ্চয় ঐ মতই পোষণ করতেন। কিন্তু এইরকম নিঃস্বার্থ শিল্পী-মনের পরিচয় দিয়ে তাঁর পক্ষে আখেরে ফল বড় ভালো হয় নি। তিনি নটগুরু এবং সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতম স্রষ্টা হ'লেও সকলেই তাঁর মাথাতেই কাঁঠাল ভেঙে ভক্ষণ করেছে পরমানন্দে। সে সময়ে একজন নৃত্য-শিক্ষকও দেড়শত টাকা মাহিনা পেতেন, অথচ নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখর কখনো আশী টাকার বেশী মাহিনা পান নি!

অর্ধেন্দুশেখর দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর অসাধারণ শিল্পনিষ্ঠা কোনদিন তাঁকে টাকা-আনা-পয়সার দিকে আকৃষ্ট হ'তে দেয় নি। এমন কি এটা বলাও চলে যে, নিজেই তিনি নিজের মাথায় দারিদ্র্যের ভার তুলে নিয়েছিলেন এবং তারও কারণ গভীর নাট্যানুরাগ। পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন তাঁর পিস্‌তুতো ভাই এবং তাঁরা নিয়মিত মাসোহারা পেতেন ও সপরিবারে বাস করতেন রাজবাড়ীতেই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে

"বুঝলে কিনা" নামে একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। বোধ করি তার উতোরেই লেখা হয় "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনখানি। আগেই বলেছি, ঐ পালাতেই অর্ধেন্দুশেখরের প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই অপরাধে অর্ধেন্দুশেখরকে সপরিবারে রাজবাড়ী ত্যাগ করতে হয়। তারও ষোলা-সতেরো বৎসর পরে তাঁর সখ হয় নিজেই একটি নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করবেন। সখ মিটল, তিনি হলেন "এমারেল্ড থিয়েটারে"র কর্তা। সখ তো মিটল, কিন্তু ব্যবসায়ী না হ'লে কেউ কি রঙ্গালয় চালাতে পারে? তিনিও পারলেন না, উল্টে দেনার দায়ে নিজের বসতবাড়ীখানা পর্যন্ত বেচে ফেলতে বাধ্য হলেন।

সেকালে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর যথাক্রমে গম্ভীর এবং হাস্য রসে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক যুগে বিলাতেও ঐ দুই বিভাগে যথাক্রমে প্রাধান্য বিস্তার করতেন স্যার হেনরি আর্ভিং ও জন লরেন্স ট্যুল। কিন্তু ট্যুলের চেয়ে অর্ধেন্দুশেখর এক বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর ছিলেন। তিনি অনুরূপ দক্ষতা প্রকাশ করতে পারতেন গম্ভীর ও করুণ প্রভৃতি রসের ভূমিকাতেও।

উচ্চ ও নিম্ন— দুই শ্রেণীর হাসি নিয়েই তাঁর কারবার ছিল। অর্ধেন্দুশেখরের "আবুহোসেন" যিনি দেখেন নি তাঁর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। এই যুবকের ভূমিকায় বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন কৌতুকরসের পরাকাষ্ঠা। তেমন "আবুহোসেন" আজ পর্যন্ত আর কেউ দেখাতে পারলে না। বিদ্যাদিগগজের ভূমিকাতেও তিনি একটি পরম উপভোগ্য চরিত্র সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। "তুফানী" পালায় বিয়ে-পাগলা বুড়ো সেজে তিনি নিজে বড় হাসতেন না, কিন্তু দর্শকরা তাঁর ধরনধারন দেখে ও কথা শুনে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ত।

বৃদ্ধের ভূমিকায় তাঁর চেয়ে ভালো অভিনেতা আমি আর দেখি

নি। আবার সাহেব সেজে তিনি এমন নিখুঁত অভিনয় করতে পারতেন যে, তাঁকে বাঙালী ব'লে চেনবার উপায় থাকত না। এইজন্যে নাট্যজগতে তাঁর ডাকনাম ছিল "সাহেব"। আমাদের নাট্যজগতে আর যে সব নট য়ুরোপীয়দের ভূমিকা গ্রহণ করেন, সাধারণতঃ অতি-অভিনয়ের জন্যে ভূমিকাগুলি পরিণত হয় 'ক্যারিকেচারে'। এ দোষ তাঁর অভিনয়ে কখনো দেখা যেত না। আর এক শ্রেণীর ভূমিকাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীর শক্তি জাহির করে গিয়েছেন— যেমন রমেশ, রূপচাঁদ ও দানসা ফকির প্রভৃতি।

"প্রফুল্ল" নাটকের যোগেশ একটি বিখ্যাত ভূমিকা। "যোগেশ" রূপে গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের চরম সীমায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ভূমিকায় একদিন অর্ধেন্দুশেখরের নাম বিজ্ঞাপিত হওয়াতে আমি দেখতে গেলুম সাগ্রহে। হতাশ হ'তে হল না। তিনি দেখালেন সম্পূর্ণ নূতন ধারণা। কেবল দুই জায়গায় তিনি গিরিশচন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি এবং আর কেউ পারবেন বলেও বিশ্বাস হয় না। শুঁড়ীখানার দৃশ্যে এবং শেষ-দৃশ্যে গিরিশচন্দ্র ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়।

তিনি আর এক আশ্চর্য শক্তির অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে পারতেন। কোন নাটকে একাই যখন তিন-চারটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যেত তিন-চার রকম পরিবর্তন। এ শক্তি আর কোন নটের আছে ব'লে জানি না। কত কঠিন কণ্ঠ-সাধনার দ্বারা এই দুর্লভ শক্তি অর্জন করা যায়, তা ধারণাতেও আসে না।

কিন্তু তিনি অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেছেন নাট্যাচার্য রূপে। তিনি যে ভাবে নাট্যশিক্ষা দিতেন, গিরিশচন্দ্র তা পারতেন না।

পূর্বে জার্মানীর যে মিনিন্‌জেন নাট্য-সম্প্রদায়ের কথা বলেছি, সেখানে মহলার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত পরিপাটি। সেখানে নূতন নাটকের মহলা দেওয়া হ'ত সুদীর্ঘকাল ধ'রে অশ্রান্ত ভাবে। যতদিন না প্রত্যেক ছোট ভূমিকাটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে, ততদিন কোন নাটকই মঞ্চস্থ করা হ'ত না। মস্কো আর্ট থিয়েটারেও ছিল ঐ ব্যবস্থা। সেখানে একাধিক বৎসরব্যাপী মহলার কথাও শোনা যায়।

এখন গিরিশচন্দ্রের নিজের মুখে অর্ধেন্দুশেখরের পদ্ধতির কথা শুনুন: 'অর্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তার জন্য বিব্রত। * * * ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনও রূপে শিখিতেছে না, অর্ধেন্দু তাকে কোনরূপে শিখাইবেনই। * * * তাঁহার কার্যে বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিখুঁত না হইলে সে অভিনেতার আর নিস্তার নাই।'

বাংলা রঙ্গালয়ে অর্ধেন্দুশেখরের কাছে শিক্ষালাভ করেন নি, এমন নট-নটী খুব কম। অমৃতলাল বসু ও তারাসুন্দরীও তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর হাতে-গড়া অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল বসু, তারকদাস পালিত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকোবাবু) ও ক্ষেত্রমোহন মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

নিজের জাতীয়তা সম্বন্ধে অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। কলকাতার সাহেবপাড়ার রঙ্গালয়ে ডেভ কার্সন নামে এক ইংরেজ নট, "বেঙ্গলী বাবু"কে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন "ডেভ কার্সন সাহেব কা পাকা তামাসা।" অর্ধেন্দুশেখরের মর্মে বিদ্ধ হ'ল এই ব্যঙ্গবাণ। তিনিও তৎক্ষণাৎ রচনা ক'রে ফেললেন (ইংরেজী ও হিন্দীতে) একটি ব্যঙ্গ-কবিতা বা গীত এবং

নিজে সাহেবপাড়ার রঙ্গমঞ্চে গিয়ে ফিরিঙ্গী পোষাক প'রে বেয়ালা বাজিয়ে সেই হাসির গানটি গেয়ে এলেন। সেই ব্যঙ্গাভিনয়ের নাম ছিল "মুস্তফী সাহেব কা পাকা তামাসা।"

অর্ধেন্দুশেখরের বাংলা গান রচনারও অভ্যাস ছিল। তাঁর রচিত একটি গান এবং উপরোক্ত ব্যঙ্গরচনাটি আমার দ্বারা সম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। এবং তাঁর রচিত একখানি নাটিকাও বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল।

তাঁর মত নিস্পৃহ এবং একান্তভাবেই নাট্যগতপ্রাণ শিল্পী বাংলা রঙ্গালয়ে আজ পর্যন্ত আর দেখা যায় নি। তিনি নিজে সম্পূর্ণভাবেই রিক্ত হ'য়ে আমাদের পরিপূর্ণ আনন্দদান ক'রে গিয়েছেন।

এগারো

নাটোরের মহারাজা এবং প্রাতঃস্মরণীয়া অর্ধবঙ্গের অধীশ্বরী রাণী ভবানীর ও পরম সাধক রাজর্ষি রামকৃষ্ণের বংশধর ব'লেই জগদিন্দ্রনাথের নাম এতটা বিখ্যাত হয়ে ওঠে নি। তাঁর আগে আরো অনেকেই নাটোরের মহারাজা উপাধি লাভ করেছেন। কিন্তু লোকে তাঁদের নাম মনে রাখে নি। জগদিন্দ্রনাথ স্বহস্তেই রচনা করেছেন নিজের খ্যাতির সোপান। "সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে"— তা তিনি রাজাই হোন, আর প্রজাই হোন। কেবল বংশমর্যাদা বা উপাধি কারুকেই যশস্বী করতে পারে না।

জগদিন্দ্রনাথকে আমি প্রথম দেখি ইডেন গার্ডেনের খেলার মাঠে, ক্রিকেট-খেলোয়াড়রূপে। সে সময়ে তিনি ভারতের নানা প্রদেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের আনিয়ে বিপুল ব্যয়ে গঠন করেছিলেন প্রসিদ্ধ নাটোরের দল। কুচবিহারের মহারাজা স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরও তখন আর একটি স্মরণীয় দল গড়েছিলেন; তিনি বিলাত ও অষ্ট্রেলিয়া থেকেও আনাতেন নামজাদা খেলোয়াড়দের। কিন্তু নাটোরের দলের গৌরব বেশী, কারণ তা গঠিত হয়েছিল ভারতীয়দের নিয়েই। এই দুই মহারাজার দল কলকাতার ক্রিকেট খেলার আদর্শকে যতটা ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিল, আজ পর্যন্ত আর কোন দল তা পারে নি। জগদিন্দ্রনাথের নাটোরের দলের অবদান নিয়েই একটি বৃহৎ ও চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রচনা করা যায়, কিন্তু আমাদের সে স্থান নেই।

তারপর জগদিন্দ্রনাথকে দেখি পূর্ণিমা সম্মিলনের এক অধিবেশনে। সেদিন ক্রিকেট-ব্যাট ফেলে তিনি ধরেছিলেন পাখোয়াজ। তাঁর হাতে পাখোয়াজ বড় মিষ্ট বাজত। স্মরণ হচ্ছে যেন সেই আসরেই তাঁর পুত্র ও বর্তমান মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়ের গানও শুনেছিলুম। সেদিন আর এক ব্যাপারে মনে জেগেছিল বিস্ময়। এদেশে নাচ আগে ছিল নট-নটী, বাইজী ও খেমটাওয়ালীদের নিজস্ব। কিন্তু এখন আমাদের ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত বড় বউ, ছোট বউ থেকে বড় বাবু, ছোট বাবু পর্যন্ত যে কেহ আসরে গিয়ে ধেই ধেই করলেও কেউ অবাক হবার নাম করে না। কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলছি তখন সাহিত্যিক ও বিদগ্ধদের সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোন শিক্ষিত পুরুষ যে পায়ে নূপুর প'রে নৃত্য করতে পারেন, সেটা ছিল একেবারেই কল্পনাতীত, কারণ বাংলা নাচ তখনও জাতে ওঠে নি। অথচ সেদিনকার সভায় যখন জগদিন্দ্রনাথের শিল্পী-সহচর স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসুকে নৃত্য করতে দেখলুম, তখন চমকিত হয়েছিলুম বৈকি!

তারপর জগদিন্দ্রনাথ ব্যাট ও পাখোয়াজ শিকায় তুলে রেখে কলম ধ'রে "মানসী"র দলের নায়ক হয়ে বসলেন। অবশ্য তাঁর সাহিত্যিক মনোবৃত্তির অভাব হয় নি কোনদিন। সাহিত্যসেবকদের বরাবরই তিনি ভালোবেসে এসেছেন, সাহিত্যাচার্য রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু ধুরন্ধর সাহিত্যিক ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিজেও ছিলেন তিনি যথার্থ কবি ও প্রবন্ধ রচনায় বিশারদ। কিন্তু এবারে তিনি একান্তভাবে সাহিত্যকে নিয়েই মেতে উঠলেন। অধিকার করলেন "মানসী"র সম্পাদকীয় আসন। মাসে মাসে উপহার দিতে লাগলেন গদ্যে-পদ্যে বিবিধ রচনা।

এই সময়ে "মানসী"র পক্ষ থেকে তিনি একটি প্রীতি-ভোজনের

আয়োজন ক'রে কলকাতার সমস্ত সাহিত্যিকদের করলেন সাদরে আমন্ত্রণ। অনুষ্ঠান হয় তাঁর বালীগঞ্জের বাগান-বাড়ীতে। তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন বড়, মেজো, সেজো, ছোট প্রত্যেক সাহিত্যিকই— প্রমথ চৌধুরী থেকে আমার মত নগণ্য ব্যক্তি পর্যন্ত। সেইদিনই জগদিন্দ্রনাথকে প্রথম ভালো ক'রে কাছে পেয়ে উপলব্ধি করতে পারলুম, তিনি কেবল সুলেখক নন, সরস বাক্যালাপেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা, যে বিশেষ গুণটি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসুর সংলাপে। কথা কইতে কইতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মুখে মুখেই উদ্ধার করতে লাগলেন ভূরি ভূরি শ্লোক। বুঝলুম সংস্কৃত সাহিত্যও তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁর আকৃতিও ছিল রাজোচিত; যাকে বলে সুপুরুষ, তিনি ছিলেন তাই। কোন দুর্ঘটনায় তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেজন্যে তাঁর মৌখিক-সৌন্দর্যহানি হয় নি।

রসালাপ ও গল্পের ভিতর দিয়ে সকাল গড়িয়ে চলল দুপুরের দিকে। জগদিন্দ্রনাথ বললেন, 'আর গল্প নয়, আহার্য আর আসন আপনাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, সকলে গাত্রোত্থান করুন।'

আসনে গিয়ে উপবেশন ক'রে সামনেই দেখলুম আহার্যের যে সুবৃহৎ স্তূপ, তার সদ্ব্যবহার করতে হ'লে রীতিমত দুঃসাহসের প্রয়োজন। এটা আমার নিজের কথা। কিন্তু আমাদের দলের কেউ কেউ ছিলেন বিখ্যাত ঔদরিক, সেদিন তাঁদের আনন্দ যে সীমাহারা হয়েছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে সেদিন এমন একটি জিনিষ গলাধঃকরণ করবার সুযোগ হয়েছিল, যার আস্বাদ আজও ভুলতে পারি নি। সেটি হচ্ছে বিশেষরূপে বিখ্যাত নাটোরের কাঁচাগোল্লা। তাও পেলুম মাত্রাতিরিক্ত— ঠিক তালের মতই বৃহৎ একতাল সন্দেশ!

সে আর কত বৎসরের কথা হবে? সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ বোধ হয়। কিন্তু সাহিত্যিকদের যে প্রকাণ্ড দলটি সেদিনকার সেই প্রীতিভোজের আসরটিকে আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত ক'রে তুলেছিল, তার মধ্যে তিন-চারজনের বেশী লোক এখন আর বর্তমান নেই ইহধামে। ব্যাধি-বার্ধক্যের ধাক্কা সামলে যে তিন-চারজন আজও কায়ক্লেশে টিকে আছেন, তাঁরাও বোধ করি মনে মনে সর্বদাই বলছেন—

"ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায়!"

মানুষের জীবন কি ভঙ্গুর! আজ উৎসব, কাল শ্মশান। এই ক্ষণিকের অস্তিত্বকেও আমরা হাসিখুসি দিয়ে ভূষিত করতে পারি না, এর জন্যে দরকার হয় কত হানাহানি আর রেষারেষি। মানুষ কি যুক্তিহীন!

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে বলেছি, প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার ঠিক আগেই জগদিন্দ্রনাথ ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় "মর্মবাণী" নামে সাহিত্য-সম্পর্কীয় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরিয়েছিল এবং আমি ছিলুম তার সহকারী সম্পাদক। এই সূত্রেই জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে ওঠে অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

মহারাজা আমাকে পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্যে একটি ছোট গল্প রচনা করতে বললেন। আমি রচনা করলুম, "সোনার চুড়ি"। অমূল্যবাবু বললেন, 'মহারাজাকে শুনিয়ে আসুন।' চৌরঙ্গীর উপরে ছিল "মানসী" কার্যালয়। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বসত জগদিন্দ্রনাথের বৈঠক। গিয়ে দেখি ঘরের ভিতরে ব'সে আছেন

জগদিন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং আরো কেউ-কেউ— সকলের নাম আর মনে পড়ছে না।

মহারাজা বললেন, 'এই যে হেমেন্দ্রবাবু, গল্প এনেছেন ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'পড়ুন তো শুনি।'

গল্প পাঠ করতে লাগলুম। শুনতে শুনতেই মহারাজা মাঝে মাঝে সাধুবাদ দিতে লাগলেন। তারপর পাঠ সমাপ্ত হ'লে এমন মুক্ত ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা আরম্ভ করলেন যে, লজ্জায় আমি অধোবদন হয়ে রইলুম। এ স্বভাব আমার আজও যায় নি। মুখের সামনে কেউ বেশী প্রশংসা করলে মনে মনে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি।

তারপর গল্পটি তো "মর্মবাণী"র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়া হ'ল যেন বোল্‌তার চাকে ঢিল! কাগজে কাগজে প্রচারিত হ'তে লাগল, গল্পের ভিতর দিয়ে আমি নাকি দুর্নীতি প্রচার ও হিন্দুনারীর পবিত্র সতীত্বকে অপমান করবার চেষ্টা করেছি, প্রভৃতি। সাপ্তাহিক "বসুমতী"তে (খুব সম্ভব সম্পাদক শশীবাবু) আমাকে এক কলমব্যাপী গালিগালাজ না ক'রে ঠাণ্ডা হলেন না (খুব সম্ভব সেদিন তিনি রচনার বিষয়-বস্তু খুঁজে পাচ্ছিলেন না)।

তারপর যেদিন জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, আমি বলছি, আপনার গল্পটি সুন্দর হয়েছে। যারা গালাগালি দিয়ে ক'রে খায়, তাদের কথায় ক্ষুণ্ণ হবেন না।'

আমি বললুম, 'ক্ষুণ্ণ আমি হই নি মহারাজ! দেখতে আমি রোগা বটে, কিন্তু আমার চাম্‌ড়া বড় কড়া, বাক্যবাণ তা বিদ্ধ করতে পারে না।'

"মর্মবাণী"র কার্যালয় ছিল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, শ্রীমানী মার্কেটের

সামনে। তার এক কি দেড় বৎসর আগে সেইখানেই ছিল মাসিক পত্রিকা "যমুনা"র কার্যালয়। সেখানে খালি আপিস নয়, আমরা একটি সাহিত্য-বৈঠকও বসিয়েছিলুম, প্রতি সন্ধ্যায় তখনকার যশস্বী সাহিত্যিকরা সেখানে ব'সে ওঠা-বসা, আলাপ-আলোচনা করতেন। সে সব বিখ্যাত নামের তালিকা এখানে দিলুম না, কারণ তালিকা হবে সুদীর্ঘ।

জগদিন্দ্রনাথও বৈকালের দিকে আসতেন মাঝে মাঝে এবং প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থাকত সদ্য-রচিত কবিতা। সেইসব কবিতা তিনি পাঠ ক'রে শোনাতেন তাঁর সুন্দর কণ্ঠে।

একদিন তিনি জানলার আলোকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটি নূতন কবিতা পাঠ করতে উদ্যত হলেন এবং সেখানে উপস্থিত আমি ছাড়া আরো দুইজন সাহিত্যিক (তাঁদের নাম আর করলুম না)।

সেই সাহিত্যিক বন্ধুরা জানালেন— মহারাজ, আপনি কেন লেখা শোনাবার জন্যে কষ্ট ক'রে এত দূরে আসেন? খবর দিলেই তো আমরা আপনার ওখানে গিয়ে কবিতা শুনে আসতে পারি!

জগদিন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'আপনারা আমার ওখানে গিয়ে কবিতা শুনে আসতে পারবেন, কিন্তু হেমেন্দ্রবাবু পারবেন না— উনি 'মর্মবাণী'র কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন, আর আমি বিশেষ ক'রে ওঁকেই আমার কবিতা শোনাতে চাই। কেন জানেন? হেমেন্দ্রবাবু স্পষ্ট ভাষায় মত প্রকাশ করেন। সেদিন আমাকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, আমার গদ্য রচনা নাকি আধুনিক যুগের উপযোগী নয়, কিন্তু আমার কবিতাগুলি হয় খুব ভালো। অথচ অন্য যে সব সাহিত্যিকের কাছে গদ্য-পদ্য যে কোন রচনা প'ড়ে শুনিয়েছি, তাঁরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কেবল প্রশংসা করেছেন— কেবল প্রশংসা!'

সাহিত্যিক বন্ধু দুইজন মৌনবাক। আমি অপ্রতিভ। জগদিন্দ্রনাথ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে গম্ভীর, উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করতে লাগলেন।

রাজা-মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিদের যাঁরা চাটুবাদের দ্বারা খুসি করতে চান, তাঁরা নির্বোধ ছাড়া আর কিছু নন। জ্ঞানোদয় থেকে যাঁরা চাটুবাদ শুনতে অভ্যস্ত হয়েছেন, ও-ব্যাপারটাকে তাঁরা উপসর্গ ব'লেই মনে করেন। স্পষ্টভাষীদের তাঁরা শ্রদ্ধা করেন— মনে মনে খুসি হ'তে না পারলেও।

এ জীবনে বহু উপাধিধারী ও প্রায়-স্বাধীন রাজা এবং মহারাজার সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু জগদিন্দ্রনাথের মত ধীমান, বিদগ্ধ ও সুরসিক মহারাজা আর কখনো দেখি নি। তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক গল্প বলতে পারতুম, কিন্তু আপাতত স্থানাভাব।

জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যুও অত্যন্ত সকরুণ। কলকাতার গড়ের মাঠের মধ্যবর্তী রাজপথে পদব্রজে ভ্রমণ করছিলেন, হঠাৎ একখানা মোটর গাড়ীর ধাক্কায় তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হন। কিন্তু অন্তিমকালেও তিনি নিজের মহত্ত্বের অপূর্ব পরিচয় দিয়ে যান। ব'লে গিয়েছিলেন, 'যে গাড়ী আমাকে ধাক্কা মেরেছে, তার চালককে যেন কোন দণ্ড দেওয়া না হয়।'

বারো

আগে আগে একটা ব্যাপার দেখে ভারি অবাক হতুম। সভাস্থলে হঠাৎ একজন বক্তাকে অনুরোধ করা হ'ল বক্তৃতা দেবার জন্যে। সেদিন তাঁর বক্তৃতা দেবার কথা নয়, তবু তিনি অপূর্ব-কল্পিত বিষয় নিয়ে অনায়াসেই সুদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে অনুরোধ রক্ষা করলেন। কিন্তু এখন আর এসব দেখে অবাক হই না। কারণ বক্তাদের গুপ্ত কথা জানতে পেরেছি।

বিপিনচন্দ্রের সমধিক খ্যাতি বক্তৃতার জন্যেই। অচিন্তিতপূর্ব বিষয় নিয়ে তিনি যখন-তখন মুখে মুখেই চমৎকার বক্তৃতা রচনা করতে পারতেন। রামগোপাল ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন ও সুরেন্দ্র-নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন, কিন্তু বিপিনচন্দ্র ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষার বক্তৃতাতেই প্রকাশ করতেন সমান দক্ষতা।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁর বাংলা বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত জন-প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে উচ্চতর বস্তু বা যুক্তি বেশী থাকত না বটে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণেই থাকত অগ্নিমন্ত্রের উগ্রতা। তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিমান প্রতিবাদ, হিংস্র স্বাদেশিকতার পক্ষপাতী। একদিন বিডন গার্ডেনে বক্তৃতা দিতে উঠে ওজস্বিনী ভাষায় বললেন, 'তোমরা কেউ ইংরেজের কাছে কিল খেয়ে কিল চুরি কোরো না, পথে-ঘাটে যদি আত্মসম্মান বজায় রাখতে চাও, তাহলে ঘুসির বদলে ঘুসি মারতে শেখো।' আর একদিন স্পষ্ট বললেন, 'সাদা পাঠা দেখলেই ধ'রে বলি দেবে!' সাদা পাঁঠা, অর্থাৎ ইংরেজ।

এই শ্রেণীর কথায় যে বক্তার intellect বা মনীষার পরিচয় পাওয়া যেতনা, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত সম্পূর্ণভাবেই, কারণ তিনি চাইতেন কেবল জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে এবং তাঁর এই সব গরম গরম বুলি জনতার মধ্যে যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা জাগ্রত করত, বর্ণনার দ্বারা আজকের দিনে তা বুঝানো যাবে না।

জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সম্মান, পূজা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর সমাদর আরো বেড়ে ওঠে। তখন তিনি ইংরেজী "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক। তাতে একটি প্রবন্ধ বেরুলো, গভর্মেণ্ট বললেন, সেটি রাজদ্রোহমূলক এবং অরবিন্দ তার লেখক। তখনি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হ'ল। সম্পাদক বিপিনচন্দ্রকে আদালতে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'অরবিন্দ ঐ প্রবন্ধটি লিখেছেন কিনা?' বিপিনচন্দ্র উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি আদালতের অপমান করেছেন এই অজুহাতে তাঁর প্রতি ছয়মাস কারাবাসের হুকুম হ'ল।

মুক্তিলাভের পর তাঁর জেল থেকে প্রত্যাগমনের পথগুলি হয়ে উঠল একেবারে জনাকীর্ণ। হাজার হাজার লোকের মুখে গগন-ভেদী জয়ধ্বনি। কাতারে কাতারে লোক চারিদিক থেকে বিপুল আগ্রহে ছুটে আসতে লাগল একটিবার তাঁকে চোখে দেখবার জন্যে। রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ। পথে গাড়ী চলছে একখানি মাত্র, যার উপরে আছেন বিপিনচন্দ্র। তাঁকে দেখলুম খোলা গাড়ীর উপরে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে সহাস্যমুখে তিনি গ্রহণ করছেন বিপুল জনতার অভিনন্দন। ফিরে এলেন তিনি বিজয়ী বীরের মত।

কিন্তু কেবল জনতা-ক্ষ্যাপানো তপ্ত বক্তৃতা নয়, বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশ্রেণীর বক্তৃতাতেও তিনি নিজের চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়

দিয়ে গিয়েছেন এবং ভালো বক্তা মানেই ভালো লেখক। যে কোন লেখক বক্তা হ'তে পারেন না, কিন্তু যে কোন বক্তা লেখক হ'তে পারেন। বিখ্যাত বক্তারা প্রস্তুত হবার সময় পেলে বক্তব্য বিষয় নিয়ে আগে নিবন্ধ রচনা করেন। কেশবচন্দ্র সেন ও সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভালো লেখক ছিলেন। বিপিনচন্দ্রও তাই। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বহু দৈনিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিয়মিতভাবে লেখনী চালনা করেছেন এবং বাংলাতেও অসংখ্য সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি আমাদের মাতৃভাষার সমুজ্জ্বল অলঙ্কার। দুঃখের বিষয়, সেগুলি অধুনালুপ্ত সাময়িক পত্রিকার অন্তরালেই আত্মগোপন ক'রে আছে। প্রকাশকরা সেগুলির দিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করবার জন্যে আগ্রহ দেখান না, নাটক-নভেল নিয়েই তাঁদের হাত জোড়া। নাটক-নভেলও সাহিত্যের সম্পত্তি বটে, কিন্তু প্রবন্ধ-পুস্তকের দৈন্য কোন সাহিত্যকেই উচিতমত সমৃদ্ধ করতে পারে না।

তিনি কেবল চিন্তাশীল নন, রীতিমত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দলাদলির আবর্তে প'ড়ে মাঝে মাঝে ঘুলিয়ে যেত তাঁর মনীষা। অন্যান্য অনেকের মত তিনিও বহু-প্রশংসিত ও বহুনিন্দিত রবীন্দ্র-নাথকে আক্রমণ ক'রে যারপরনাই অবিচার করেছেন। কতকগুলো কষ্টকল্পিত ও মূল্যহীন যুক্তির সাহায্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য গল্প, উপন্যাস, ও প্রবন্ধাবলীকে নস্যাৎ ক'রে দেবার চেষ্টা করে-ছিলেন। একবার নয়, দুইবার নয়, বার বার। রবীন্দ্র-রচনার পাঠক আজ পৃথিবীব্যাপী, কিন্তু তাঁর সে-সব রচনার পাঠক নেই আজ একজনও। বৃথাই তিনি এঁকে গেলেন জলের আল্পনা।

শেষের দিকে তিনি রাজনীতির চেয়ে সাহিত্যের চর্চাই করতেন বেশী। চিত্তরঞ্জন দাশের (তখনও তিনি 'দেশবন্ধু' উপাধিলাভ

করেন নি) পৃষ্ঠপোষকতায় যখন মাসিকপত্র "নারায়ণ" প্রকাশিত হয়, বিপিনচন্দ্রই তার প্রধান ভার গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তখন "সবুজপত্র", তার প্রতিযোগী হয়ে বেরুতে লাগল "নারায়ণ"। তার একাধিক লেখক বাষ্পাচ্ছন্ন ঝাপসা চোখে দিকবিদিক হাতড়ে ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন কোথায় আছে বাংলার প্রাণ ? কোথায় যে আছে তা স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেল না বটে, কিন্তু থেকে থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল রবীন্দ্রনাথকে ও রবীন্দ্রপন্থিগণকে আক্রমণের চেষ্টা।

প্রথম যখন বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাই, আমি তখন "সঙ্কল্প" নামে স্বল্পজীবী বৃহৎ মাসিকপত্রে সহকারী সম্পাদকের কাজ করি। সুকিয়া (এখন কৈলাস বোস) স্ট্রীটে লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামে একটি বড় ছাপাখানা ছিল, "সঙ্কল্প" মুদ্রিত হ'ত সেইখানেই। বিপিনচন্দ্রের সম্পাদনায় তখন একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র (বোধহয় নাম তার "হিন্দু রিভিউ") প্রকাশিত ও মুদ্রিত হ'ত ঐ মুদ্রাযন্ত্রেই। আমাকেও প্রায় ছাপাখানায় যেতে হ'ত, বিপিনচন্দ্রেরও না গিয়ে উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে বিলম্ব হ'ল না।

শ্যামবর্ণ, মাঝারি আকারের বেশ ফিটফাট মানুষটি— সিল্কের চাদর, সিল্কের পাঞ্জাবী, সিল্কের কাপড়, বয়স হ'লেও সৌখিনতার অভাব নেই। দাড়ী-গোঁফ কামানো, চোখে চশমা। মুখশ্রী সুন্দর না হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক, সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

একদিন দেখলুম তাঁর সামনের টেবিলের উপরে রয়েছে দুই-খানি হাফটোন ছবির ব্লক। ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলুম, অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর অভিনয়ের ছবি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'ও ব্লক আপনার টেবিলে কেন ?'

তিনি বললেন, 'ইংরেজীতে তারাসুন্দরীর অভিনয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছি, তারই ছবি।'

বিপিনচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম এবং তখনকার দিনে অধিকাংশ ব্রাহ্মই ছিলেন বাংলা রঙ্গালয়ের বিরোধী। কেবল ব্রাহ্মই বা বলি কেন, কোন হিন্দু সম্পাদকও তখন পর্যন্ত সাহিত্য সম্পর্কীয় মাসিক পত্রিকায় নট-নটীর ছবি প্রকাশ করেন নি। সুতরাং বেশ বিস্মিত স্বরেই বললুম, 'আপনার কাগজে ঐ ছবি ছাপা হবে, নটীর অভিনয় সমালোচনা বেরুবে!'

তিনি মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, 'তাতে দোষটা কিসের? নাট্যসাধনা একটা বড় ব্যাপার, তারাসুন্দরী একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।'

এমনি ছিল তাঁর সংস্কারমুক্ত মন। অথচ এমন নির্মুক্ত মনও সময়ে সময়ে বদ্ধ হয়ে পড়ত, তারও পরিচয় পরে দেব।

একদিন আমার বন্ধুদের মধ্যে তর্ক বাধল, "প্লে-রাইট" বড় না "ড্রামাটিষ্ট" বড়? এসম্বন্ধে এখনো এদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির সন্দেহের অভাব নেই। এই সেদিনই শ্রীশিশিরকুমার ভাতুড়ী গিরিশচন্দ্রকে "প্লে-রাইট" বলেছিলেন ব'লে গিরিশচন্দ্রের অপমান করা হয়েছে ভেবে জনৈক ভদ্রলোক প্রভূত উষ্মা প্রকাশ না ক'রে ক্ষান্ত হ'তে পারেন নি এবং তিনি এম-এ ডিগ্রীধারী।

একদিন বিপিনচন্দ্রের কাছে ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলুম। তিনি বললেন, ' "প্লে-রাইট" আর "ড্রামাটিষ্ট", ওঁরা কেউ কারুর চেয়ে ছোট বা বড় নন। তফাৎ খালি এই, "প্লে-রাইট" একটি বিশেষরঙ্গালয়ের সুবিধা-অসুবিধা দেখে, নট-নটীদের প্রকৃতি বুঝে নাটক রচনা করেন, আর "ড্রামাটিষ্ট" হচ্ছেন নিরঙ্কুশ, তিনি কোন্‌-দিকেই ভ্রুক্ষেপ না ক'রে স্বাধীন ভাবেই লেখনীচালনা করতে

পারেন। তবে এটা ঠিক যে, "ড্রামাটিষ্টে"র চেয়ে "প্লে-রাইটে"র কর্তব্য কঠিনতর।'

আমি বললুম, 'তা'হলে সেক্সপিয়র একজন "প্লে-রাইট" ?'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়।'

আমিও তাই জানতুম। বিপিনচন্দ্রের মত বিশেষজ্ঞের সমর্থন পেয়ে আমার মত সুদৃঢ় হয়ে উঠল।

তার কিছুকাল পরে "সঙ্কল্পে"র অকালমৃত্যু ঘটল। আমি "মর্মবাণী"র সহকারী সম্পাদক। "নারায়ণ" আত্মপ্রকাশ করেছে। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করতে "নারায়ণ" কার্যালয়ে যাই মাঝে মাঝে। একদিন তিনি আমার কাছে একটি ছোটগল্প চাইলেন। "কুসুম" নামে একটি গল্প লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। পরদিন রচনাটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'এ শ্রেণীর গল্প "নারায়ণে" চলবেনা।'

গল্পটি "মর্মবাণী"র জন্যে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিলুম। প্রুফ এল। অন্যতম সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তা পাঠ ক'রে বললেন, 'এরকম গল্প "মর্মবাণী"তে বেরুতেই পারে না।'

সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে "কুসুম" অবশেষে আশ্রয় পেলে "ভারতী"র অঙ্কে। সম্পাদক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় গল্পটি পাঠ ক'রে খুব প্রশংসাই করলেন। কিন্তু গল্পটির গল্প এখনো শেষ হয়নি।

তারপর কেটে গেল এক যুগ। জার্মানীর বার্লিন সহর থেকে ডক্টর রাইনহার্ড ভাগনার নামে এক ভাষাতত্ত্ববিদ পত্র লিখে আমাকে জানালেন, তিনি আমার কয়েকটি গল্প জার্মান ভাষায় তর্জমা করবেন এবং সেজন্যে আমার সম্মতি চান। তাঁর দ্বারা নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে "কুসুম"ও স্থান পেয়েছে দেখলুম।

পত্রোত্তরে সম্মতি দিয়ে ভাগনার সাহেবকে আমি লিখলুম, 'গল্পগুলি আমার কাঁচা বয়সের রচনা।' উত্তরে তিনি লিখলেন, 'Now I am glad to send you a copy of my work. You will find in it 5 of your stories, among them the two master-pieces "Siuli" and "Kusum." Blessed be the "callow days" which produce works of such a high standard ! "Kusum" is scarcely to be surpassed in its psychological development and the art of unuttered feelings, employed in this story, must be highly admired.'

আত্মপ্রচারের জন্যে এ উদ্ধৃতি নয়। কারণ তেইশ বৎসর আগে আমি এই চিঠি পেয়েছি, কিন্তু দুই-একজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া বাইরের আর কারুকেই তা দেখাই নি। আমি এখানে দেখাতে চাই, বিপিনচন্দ্র ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যে গল্প প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন নি, নিশ্চয়ই তা প্রকাশের অযোগ্য ছিল না। বিশেষতঃ বিপিনচন্দ্রের ছিল প্রখর বিচারশক্তি। তবু তিনি গল্পটি গ্রহণ করেননি কেন ? এর উত্তর দেওয়া খুবই সহজ।

"কুসুম" গল্পের বস্তুটুকু মোটামুটি এই : গণিকা কুসুম বারান্দার উপর থেকে দেখতে পেলে, রাজপথে গাড়ী চাপা প'ড়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আহত লোকটিকে নিজের ঘরে আনিয়ে, ডাক্তার দেখিয়ে, ঔষধ দিয়ে, কয়েকদিন ধ'রে কন্যার মত সেবা ক'রে কুসুম তাঁকে সুস্থ ও সবল ক'রে তুল্‌লে। জ্ঞান লাভ ক'রে কুসুমের পরিচয় জেনেই ভদ্রলোক তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললেন, 'কী, তুই গণিকা ! আর আমি ব্রাহ্মণ হয়ে তোর হাতে জল খেয়েছি ! পাপিষ্ঠা, দূর হ, দূর হ আমার সামনে থেকে !' কুসুম কাঁদতে লাগল।

চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম, বিপিনচন্দ্রও ব্রাহ্ম, কিন্তু তাঁহাদের "নারায়ণ" পত্রিকায় নতুন এক হিন্দুত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছিল। শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন প্রায় হিন্দু হয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের মন বরাবরই ছিল ব্রাহ্মভাবাপন্ন। তবু দলগত নীতি বা "পলিসি"র খাতিরে তিনি মনে যা ভাবতেন, সব সময়ে মুখে তা স্বীকার করতে পারতেন না। তাই যে বিপিনচন্দ্র একদিন গণিকা অভিনেত্রীর ছবি ছাপতে ও তাঁকে অভিনন্দন দিতে কুণ্ঠিত হন নি, তিনিই পরে গল্পের এক কল্পিত গণিকার মহত্বকে অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণের ছুঁতমার্গের উপরে স্থান দিতে রাজি হন নি। দলগত নীতির খাতির রাখতে গিয়ে পরম উদার বিপিনচন্দ্র মাঝে মাঝে অত্যন্ত অনুদার হয়ে উঠেছেন। তারই ফলে তাঁর যুক্তিহীন রবীন্দ্রবিদ্বেষ।

তেরো

পুণ্যকীর্তি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ব'লেই সুরেশচন্দ্র বিশ্রুতনামা হন নি। তাঁর যশের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে মাসিকপত্র "সাহিত্য"। তরুণ যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কায়মনোবাক্যে "সাহিত্যে"র সেবা ক'রে গিয়েছেন। পত্রিকা সম্পাদনে এমন অক্লান্ত আন্তরিকতা দুর্লভ। সুদিনে এবং দুর্দিনে "সাহিত্য"ই ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ।

সম্পাদনা-শক্তি ছিল তাঁর অতুলনীয়। বাংলা দেশে বিখ্যাত পত্রিকার অভাব নেই। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশেরই কোন নিজস্ব সুর বা আদর্শ থাকে না। যথেচ্ছভাবে রচনা সংগ্রহ হয়। বড় বড় লেখকের সঙ্গে সঙ্গে থাকে অতি সাধারণ লেখকের কাজ। কোন বিশেষ আদর্শের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা নির্বাচন করা হয় না। নিজে কিছু রচনা না ক'রেও সম্পাদক যে বিশিষ্ট মনীষার পরিচয় দিতে পারেন, এ জ্ঞান অনেকেরই নেই।

এসব দিক দিয়ে আদর্শ সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র; এবং আদর্শ পত্রিকা ছিল "সাহিত্য"— ঠিক যেন নির্দিষ্ট সুরে বাঁধা বীণা। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ভঙ্গির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেত "সাহিত্যে"র নিজস্ব একটি মূল ভঙ্গি। নিপুণ উদ্যানপাল নানা জাতের ফুলের চারা দিয়ে বাগান রচনা করেন বটে, কিন্তু সেগুলির ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর নিজের নির্দিষ্ট ভঙ্গি ও পরিকল্পনাই। গোড়ার দিকে সুরেশচন্দ্র "সাহিত্যে"র জন্যে গুটিকয় গল্প লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তার পর নিজে রচনা-কার্য

প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন বললেই চলে, কেবল দুই-এক পাতার সংক্ষিপ্ত "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"র জন্যে লেখনীধারণ করতেন। তাঁর কারবার ছিল পরের ধন নিয়ে। কিন্তু তা পরের ধনে পোদ্দারি হয়ে উঠত না— পরস্বের মধ্যেই পাওয়া যেত তাঁর নিজস্বটুকু। তিনি যে সব রচনা নির্বাচন করতেন, সেগুলির ভিতরই থাকত তাঁর চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয়।

"সাহিত্য" লেখকদের জন্যে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করত না। তবু বিখ্যাত লেখকরা "সাহিত্যে" রচনা প্রকাশ করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। "সাহিত্যে"র লেখক হওয়া তখন যেন একটা গৌরবের বিষয় ব'লে গণ্য হত। "সাহিত্য" ছিল যেন রচনার কষ্টিপাথর। দীনেন্দ্রকুমার রায় ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকরা নিম্নশ্রেণীর বিলাতী মাসিকপত্রের গল্প থেকে স্বীকার না ক'রেই আখ্যানবস্তু গ্রহণ করতেন এবং "ভারতী" ও "প্রদীপ" প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকরা অনায়াসেই সে সব লেখা ছাপিয়ে দিতেন। কিন্তু "সাহিত্যে" এ সব অনাচার হবার যো ছিল না। সুরেশচন্দ্র যখন দীনেন্দ্রকুমারের লেখা নিয়েছেন, তখন গ্রহণ করেছেন তাঁর মৌলিক রচনা পল্লীচিত্রই। অথচ অনুবাদে তাঁর অরুচি ছিল না। তিনি জানতেন, অনুবাদে সাহিত্যের পুষ্টি হয়। "সাহিত্যে"ও ইংরেজী থেকে অনূদিত রচনা প্রকাশিত হ'ত। কিন্তু সে সব শ্রেষ্ঠ রচনার অনুবাদ।

সুরেশচন্দ্রের ভাষা ছিল যেমন মিষ্ট, তেমনি শিষ্ট। যেমন তার স্বকীয় ভঙ্গি, তেমনি তার সাবলীল গতি। স্বচ্ছ, ঝরঝরে, প্রাঞ্জল। ছোট ছোট কথা দিয়ে জাহির করতেন বড় বড় ভাব। এই চমৎকার ভাষায় প্রথম জীবনে তিনি রচনা করেছিলেন গুটিকয় চমৎকার গল্প, পরে "সাজি" নামে সেগুলি পুস্তকাকারে

প্রকাশিত হয়। ''ডালি'' নামে আর একখানি যন্ত্রস্থ গল্পগ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেখতুম "সাহিত্যে''র মলাটে, তবে যন্ত্রগর্ভ থেকে নির্গত হয়েছিল ব'লে মনে পড়ে না। কিন্তু গল্পরচনায় এমন দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কেন যে তিনি লেখনী ত্যাগ করলেন জানি না। কারণ হয়তো কুড়েমি। তা না হলে আজ তিনি কথাসাহিত্যেও স্থায়ী যশ অর্জন করতে পারতেন।

সুরেশচন্দ্রের রচনানির্বাচনশক্তি দেখেই বোঝা যায়, সমালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টি থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সমালোচকের প্রধান যা গুণ, সেই নিরপেক্ষতার অভাব ছিল তাঁর যথেষ্ট। ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্যেও তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছেন বার বার। সুবিধা পেলেই তিনি তীব্র ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করতে ছাড়তেন না। মাঝে মাঝে প্রশংসাও যে করেন নি, তা নয়— কিন্তু সে একটুখানি সুখ্যাতি আর অনেকখানি অখ্যাতি— প্রায় চারআনা আর বারআনা। কেবল রবীন্দ্রনাথকে নয়, রবীন্দ্রনাথের ভক্তদেরও। ছবির মর্ম তিনি কতটুকু বুঝতেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, কিন্তু প্রাচ্য চিত্রকলার বিরুদ্ধে তিনি দস্তুরমত 'জেহাদ' ঘোষণা করেছিলেন। কুযুক্তির সাহায্য নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন যেখানে সেখানে।

অনেকে মনে করেন "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"য় তিনি অতুলনীয় বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আমি তা মনে করি না। ঐ আলোচনায় পাঠকদের আকৃষ্ট করত প্রধানতঃ ভাষার ইন্দ্রজালে, কৌতুকরসে ও ব্যঙ্গবাণে। ঐ রকম ছোট ছোট টীকা-টিপ্পনীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পটু। যখন সাপ্তাহিক "বসুমতী"র সম্পাদক ছিলেন, তখন তাঁর লেখা "দশের কথা" সকলেই আগ্রহভরে পাঠ করতেন। অনেক নূতন লেখক তাঁকে যমের মতন ভয় না ক'রে

পারেন নি। বিখ্যাত কবি রজনীকান্ত সেন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে নিজের রচনা প্রকাশ করতে রাজি হন নি। পরে সুরেশচন্দ্রের কাছ থেকে মৌখিক অভয় পেয়ে তিনি তাঁর রচনাগুলি পাঠকদের উপহার দেন।

রামধন মিত্রের লেনে একখানি ছোট দোতলা বাড়ীতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমি সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে আসতুম। আমি তখন সাহিত্যিক হবার জন্যে চেষ্টা করছি বটে, তবে নামডাক বিশেষ কিছুই হয় নি। বয়সও যথেষ্ট কাঁচা। তা সত্ত্বেও সুরেশ-চন্দ্র আমাকে অবহেলা করেন নি—যদিও বয়সে তিনি আমার চেয়ে আঠারো উনিশ বৎসর বড় ছিলেন। ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

প্রথম যেদিন তাঁকে দেখতে যাই, বাড়ীর ভিতরে ঢুকে রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সুরেশচন্দ্রের বৈঠকখানার পাশের ঘরে চোখ পড়তেই দেখি, একটি আলনার তলায় সারি সারি সাজানো রয়েছে কয়েক জোড়া পাদুকা। মস্ত মস্ত জুতো—এত প্রকাণ্ড যে চোখ চমকে যায়! ভাবলুম, আমি লিলিপুটের মানুষ, এ কোন্ অতিকায় ব্যক্তির বাড়ীতে এসে পড়েছি!

তারপর স্বচক্ষে সুরেশচন্দ্রকে দেখলুম। তাঁকে অতিকায় বললে অত্যুক্তি হবে না। দস্তুরমত দশাসই চেহারা—যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে। গৌর বর্ণ, শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখ। সেই পুরুষোচিত দেহ এবং প্রতিভাব্যঞ্জক মুখ বৃহৎ জনতার ভিতরেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দর্শকের মনে জাগায় সম্ভ্রমের ভাব।

যখন তিনি "বসুমতী"র সম্পাদক তখন একদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সুরেশচন্দ্র সেই সপ্তাহের কাগজ হাতে ক'রে পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ভীত সাংবাদিককে অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে ভর্ৎসনা করছেন।

সাংবাদিকের অপরাধ, ছোট্ট একটি খবরে ভাষার ভুল। অধিকাংশ সম্পাদকই এই তুচ্ছ ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করতেন না, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল না অধিকাংশ সম্পাদকের মত। খবরের কাগজের টুকরো খবরেও তিনি এতটুকু ভাষার ভুল সইতে পারতেন না। আজকের সাংবাদিকদের যদি তাঁর অধীনে কাজ করতে হ'ত, তাহ'লে অধিকাংশেরই জীবন হয়ে উঠত অতিশয় অতিষ্ঠ।

কেবল সুরেশচন্দ্রের বাড়ীতে নয়, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল ও অক্ষয়কুমার বড়ালের ভবনেও মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পেতুম। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি, অক্ষয়কুমার ও মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ব'সে ব'সে গল্প করছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, আপনাকে কাল মিনার্ভা থিয়েটারের সভায় দেখলুম না ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলুম।'

—'কেমন লাগল ?'

—'ভালো লাগল খালি আপনার আর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতা। আর সব বক্তৃতাই অশ্রাব্য।'

সুরেশচন্দ্র হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, বাংলা দেশে রাম-শ্যাম সবাই বক্তা হ'তে চান। কিন্তু ঐ বক্তৃতাগুলি যদি গ্রামোফোনের রেকর্ডে তুলে রাম-শ্যামদের আবার শোনাতে পারা যায়, তাহ'লে হয়তো তাঁদের কিঞ্চিৎ আক্কেল হ'তে পারে।'

সুরেশচন্দ্র ছিলেন উচ্চশ্রেণীর বক্তা। তাঁর লেখনীর মত তাঁর মুখ দিয়েও নির্গত হ'ত সুমধুর, প্রসাদগুণপূর্ণ, শুদ্ধ ভাষা। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর ও উদাত্ত, শ্রবণকে দিত তৃপ্তি।

এইবার একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা বলি। একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ীর ঘাস-জমির উপরে বৈঠক বসেছে। উপস্থিত আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশচন্দ্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রসাদদাস গোস্বামী, অক্ষয়কুমার বড়াল, ললিত মিত্র, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী ও আমেরিকা থেকে সদ্যপ্রত্যাগত একজন ডাক্তার (হোমিওপ্যাথ)।

দেবকুমার রায় চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'আপনি কাল রবিবাবুর যে কবিতাটির কথা বলেছিলেন, আমি আজ তা প'ড়ে দেখেছি। ঠিক বলেছেন, কবিতাটি শ্লীল নয়।'

আমি বললুম, 'ও কবিতাটি পড়ে আমার মনে কিন্তু অশ্লীল ভাব জাগে না। তবে ওটি হাল্কা যৌবনের তরল ভাবের কবিতা বটে। আর সেই জন্যেই মোহিতলাল সেন সম্পাদিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর 'যৌবন-স্বপ্ন' বিভাগে কবিতাটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে।'

সুরেশচন্দ্র মুখ টিপে হাসতে হাসতে ডাক্তারকে ডেকে বললেন, 'ওহে, তোমাদের হোমিওপ্যাথিতে যৌবন-স্বপ্ন দোষের কি ওষুধ আছে না ?'

ঔষধের নাম বললেন ডাক্তার। অনেকেই হেসে উঠলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মুখ গম্ভীর। আমি লজ্জায় মাথা নত করলুম। আমার মত কনিষ্ঠের কাছেও সুরেশচন্দ্র নিজের বয়সের মর্যাদা রক্ষা করতে পারলেন না ! রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তথাকথিত অশ্লীলতা আবিষ্কার করবার জন্যে যাঁদের এত মাথাব্যথা, তাঁদের মুখ থেকে লোকে অন্তত শ্লীল ভাষাই প্রার্থনা করে। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি দ্বিজেন্দ্রলালকে আমি কোনদিন আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করতে শুনি নি।

সুরেশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হন নি— অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায় তাঁর পৃথিবীর মেয়াদ। তিনি আরো বড় হ'তে পারতেন, কিন্তু আলস্য তাঁকে আরো বড় হ'তে দেয় নি।

চোদ্দ

সাধু ভাষার সাধুতা রক্ষা করবার জন্যে চলতি ভাষাকে চলতে দেন নি গৌড়ীয় সাধু ব্যক্তিগণ। তাঁরা মাতৃভাষাকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন সংস্কৃতের সুদৃঢ় নিগড়ে। সেই নিগড় প্রথমে ভাঙেন প্যারীচাঁদ মিত্র, তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু একটি কি দুটি কোকিলের ডাকে যেমন বসন্ত আসে না, তেমনি তাঁদের সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফলে বাঙালী সাহিত্যিকদেরও নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"র ভাষা উচ্চসাহিত্যের দরবারে আভিজাত্য অর্জন করতে পারে নি বহুকাল পর্যন্ত। নাটক ও উপন্যাসের সংলাপে লেখকরা কথ্য ভাষা ব্যবহার করতেন কতকটা যেন দায়ে প'ড়েই। কোন কোন ঔপন্যাসিক তাও করতেন না। এমনকি বছর দুই আগেও দেখলুম আমাদের একজন সুবিখ্যাত লেখক উপন্যাসের সংলাপেও কথ্য ভাষাকে সাবধানে 'বয়কট' করেছেন। এ যেন জোর ক'রে নদীর মোড় ফেরাবার দুশ্চেষ্টা।

কথ্য ভাষাকে যাঁরা সম্যকরূপে জাতে তুলতে পেরেছেন, তাঁদের প্রধান অধিনায়ক হচ্ছেন দুইজন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী। পরে তাঁদের প্রভাবে প'ড়ে "ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত অধিকাংশ লেখকই উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ রচনার সময়ে অবলম্বন করেন একমাত্র কথ্য ভাষাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রতিভাবান লেখকও কথ্য ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও দুই একবার কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে

পারেন নি। কোন কোন লেখকের ধাতে কথ্য ভাষা সয় না।

'বীরবল' ছদ্মনামে প্রমথ চৌধুরী যখন প্রথম প্রথম একান্তভাবে চলতি ভাষাই ব্যবহার করতেন, রবীন্দ্রনাথও তখন তাঁর পাশে ছিলেন না। সুতরাং চলতি ভাষাকে জাতে তোলবার প্রধান গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। "বীরবলী" ভাষা বহুবার আক্রান্ত ও উপহসিত হয়েছে। কিন্তু তিনি একটুও টলেন নি, ভ্রুক্ষেপও করেন নি। "বীরবলী" পদ্ধতিতে রচনার পর রচনা ক'রে গিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের ভ্রান্তি অপনয়নের জন্যে চলতি ভাষার পক্ষ নিয়ে যথেষ্ট ওকালতি করতেও ছাড়েন নি। তিনি না থাকলে চলতি ভাষা হয়তো আজও সচল হ'তে পারত না। এ আন্দোলনের স্রষ্টা হচ্ছেন তিনিই। চলতি ভাষার মধ্যে আছে কতখানি সচলতা, সজীবতা ও বলিষ্ঠতা, সর্বপ্রথমে তা আবিষ্কার করেছিল তাঁরই দিব্য-দৃষ্টি। পরে তাঁর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি ক'রে রবীন্দ্রনাথও তাঁর পক্ষে যোগ দেন। প্রথমে তিনি সাধু ভাষাতেই প্রমথ চৌধুরীকে সমর্থন ক'রে "সবুজপত্রে" একটি প্রবন্ধ লেখেন। তারপর "পাত্র ও পাত্রী" গল্পে সর্বপ্রথমে ব্যবহার করেন চলতি ক্রিয়াপদ (১৩২৪ সাল)। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি দলে টানতে পেরেছিলেন, প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে এও একটা বিশেষ গর্বের বিষয় এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর পক্ষ গ্রহণ না করলে তিনিও চলতি ভাষার মামলা এত সহজে জিততে পারতেন না।

প্রায় বাল্যকাল থেকেই বীরবলের বিবিধ প্রবন্ধ প'ড়ে আনন্দ-লাভ ক'রে এসেছি, যদিও তখন তিনি লিখতেন অল্পই। কিন্তু অবশেষে তাঁকে রীতিমত কোমর বেঁধে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হ'ল। আমার স্বর্গীয় বন্ধু ও বিখ্যাত লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় নূতন এক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প ক'রে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রার্থনা

করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রমথ চৌধুরী যদি নূতন পত্রিকার সম্পাদক হন, তাহ'লে তিনি নিয়মিতভাবে লিখতে প্রস্তুত আছেন। মণিলাল তখন প্রমথবাবুকে গিয়ে ধরেন এবং তিনিও রাজি হন। নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল "সবুজপত্র" নামে। তার সব দিকেই নূতনত্ব। না আছে বিজ্ঞাপন, না আছে ছবির বাহার, না আছে টুকিটাকি আলাপ-আলোচনা। ছোট্ট কাগজ, গায়ে এতটুকু ব্যবসাদারির গন্ধ নেই এবং লেখকরাও পারিশ্রমিকের আশা করতেন না। "সবুজপত্র"কে উপলক্ষ্য ক'রে কেবল রবীন্দ্র-প্রতিভাই মোড় ফিরে নূতন একদিকে যাত্রা করলে না, প্রমথবাবুর লেখনীও অত্যন্ত ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে মাসে মাসে দিতে লাগল নব নব উপহার। "সবুজপত্র" প্রকাশ ক'রে মণিলাল যে বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় হিতসাধন ক'রে গিয়েছেন এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষাকে বলতে পারি ছন্দোবদ্ধ গদ্য। ঠিক এই শ্রেণীর গদ্য রচনা বাংলায় আগে ছিল না। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের কথ্য ভাষা এবং প্রমথ চৌধুরীর কথ্য ভাষা, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে আকাশ-পাতাল। আলালী ভাষা হচ্ছে হেটো ভাষা। কিন্তু বীরবলী ভাষা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারেন বিদ্বজ্জনগণ— হাটে যা হয়ে উঠবে দুর্বোধ।

কিন্তু প্রমথবাবু কেবল গদ্যের ওস্তাদ ছিলেন না, কাব্যের উপরেও তাঁর যে পরিপূর্ণ অধিকার ছিল, "সনেট পঞ্চাশৎ" রচনা ক'রে সেটাও তিনি প্রমাণিত করেছেন। আবার ছোট গল্প রচনাতেও তাঁর পাকা হাতের পরিচয় দেয় "চার ইয়ারী কথা" ও "আহুতি" নামে বই দুখানি। তাঁর আরো কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। এখনো বাজারে পাওয়া যায় কিনা বলতে পারি না। কিন্তু তিনি

প্রথম শ্রেণীর লেখক হয়েও অধিকতর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যশ্রমের নিদর্শন রেখে যান নি। বোধ হয় তিনি লেখনী ধারণের চেয়ে অধ্যয়ন ও চিন্তা করতেই বেশী ভালোবাসতেন। আমি তাঁর বাড়ীতে কখনো যাই নি বটে, কিন্তু শুনেছি তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরির আকার ছিল প্রকাণ্ড। বই কেনার ও বই পড়ার নেশা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রবল। মণিলাল যদি "সবুজপত্রের" ভার তাঁর স্কন্ধে নিক্ষেপ না করতেন, তাহ'লে হয়তো তাঁর রচনার সংখ্যা হ'ত অত্যল্প।

কেবল ইংরেজী নয়, ফরাসী সাহিত্যের উপরেও তাঁর অবাধ অধিকার ছিল। তাঁর লেখা পড়লে ও মুখের কথা শুনলে মনে হ'ত সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি ছিলেন লব্ধপ্রবেশ। কলকাতায় ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিলাতে যান ব্যারিষ্টার হবার জন্যে। ব্যারিষ্টার হয়েই দেশে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আদালতের মামলা তাঁকে আকর্ষণ করে নি। সরস্বতীর পদ্মসরোবরে জলকেলিমুগ্ধ মরালের মতই কাটিয়ে গিয়েছেন তিনি সারা জীবনটা। প্রথমে ছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, পরে হন তাঁর কুটুম্ব। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী তাঁর সহধর্মিণী।

এইবারে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বলি। মণিলাল ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তখন "ভারতী"র সম্পাদক এবং আমিও অন্তরাল থেকে "ভারতী"র সেবা করি। সুকিয়া (এখন কৈলাস বসু) স্ট্রীটে ছিল "ভারতী"র কার্যালয়। সেখানে তিনতলার বৃহৎ একটা কক্ষে প্রতিদিন বৈকালেই বসত বৃহৎ একটি সাহিত্য-বৈঠক। সেই আসরে যাঁরা নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিষ্য বা

ভক্ত এবং সেখানে রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের প্রবেশ একরকম নিষিদ্ধ ছিল বলাও চলে। সেখানে গীত হ'ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আলোচিত হ'ত রবীন্দ্র-রচনা। সেখানে আমাদের 'জাতীয় সঙ্গীত' ব'লে গণ্য হ'ত রবীন্দ্রনাথের এই গানটি— 'বিধি, ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে, সে কি আমার পানে ভুলে পড়িবে না।' সকলে সমস্বরে এই গানটি যখন-তখন গেয়ে আমরা পাড়া কাঁপিয়ে তুলতুম। আমাদের নিয়মিত গায়ক ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক অজিতকুমার চক্রবর্তী। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি অতুলপ্রসাদ সেনও সেই আসরে ব'সে গানের পর গান গেয়ে গিয়েছেন। নজরুল ইসলামও (তখন উদীয়মান) প্রায় এসে গলা ছাড়তেন। আর একটি খবর শুনলে অনেকেই বোধ করি অবাক হবেন। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল তুলি আর কলমই ধরেন না, গানের ধারও ধারেন। "ভারতী"র বৈঠকে এসে তিনি একাধিক স্বরচিত গানে নিজেই সুরসংযোগ ক'রে গেয়ে আমাদের শুনিয়ে গিয়েছেন। ও বৈঠকে যাঁরা আসতেন তাঁদের অনেকেই সাহিত্যে বা শিল্পে অমর হয়ে থাকবেন এবং তাঁদের কারুর কারুর কথা বলব যথাসময়েই।

প্রমথ চৌধুরী প্রায়ই আসতেন "ভারতী"র বৈঠকে। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, সুগঠিত দেহ, সুন্দর মুখশ্রী, পরনে বিলাতী পোষাক। চেহারা দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। প্রশান্ত মুখে গাম্ভীর্য আছে বটে, কিন্তু আলাপেব সময়ে তা মুখর হয়ে ওঠে। হাতে সর্বদাই থাকে একটা সিগারেটের কৌটো। দীনেশচন্দ্রের স্মরণীয় চা-চিনির কথা এবং শরৎচন্দ্রের আফিমের গোলকের কথা পরে বলব, প্রমথ-বাবুর সিগারেটের কৌটোর কথাও উল্লেখযোগ্য। ভদ্রলোক সাধারণতঃ এসে পাশের ছোট টেবিলের উপরে সিগারেটের কৌটোটি রেখে একখানা ইজি চেয়ারের উপরে আসন গ্রহণ

করতেন। তারপর যত কথা কইতেন তত সিগারেট টানতেন, একটা সিগারেট নেববার আগেই আর একটা সিগারেট ধরাতেন। নিজেও ধূম্রের ভক্ত, অন্যান্য ধূম্রসেবকদেরও মনের দুঃখ বুঝতেন, পাছে তাঁকে সমীহ ক'রে আমরা কষ্ট পাই, সেই জন্যে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর সামনে আমরা সকলেই অম্লানবদনে ধূমপান করতে পারি। সে আসরে আমরা ধূম্রপানের সরঞ্জাম লুকিয়ে ফেলতুম কেবল দুই জনের উপস্থিতিতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আসনস্থ হয়ে সিগারেট ধরিয়ে প্রমথবাবু বাক্যালাপ আরম্ভ করতেন। দীনেশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র ছিলেন গালগল্পের রাজা, কিন্তু প্রমথবাবু সে-রকম গল্প নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতেন না। তিনি বলতেন সাহিত্যের গল্প, ললিত কলার গল্প, মনোবিদ্যা ও দর্শনের গল্প ;— রীতিমত জ্ঞানগর্ভ উচ্চশ্রেণীর আলোচনা। তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি এমন বিস্তৃত ছিল যে আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবতুম, এত বেশী জেনেও তিনি এত কম লেখেন! প্রত্যেক বক্তব্য বিষয় নিয়ে যে তিনি স্বাধীনভাবে মস্তিষ্ক চালনা করেছেন, এটুকু বুঝতেও বিলম্ব হ'ত না। কথা কইতেন তিনি ধীরে ধীরে, মৃদু স্বরে। তিনি উচ্চশ্রেণীর কথক হ'লেও বক্তা ছিলেন না। শব্দের পর শব্দ নিয়ে তিনি কথার ইন্দ্রজাল রচনা করতেন বটে, কিন্তু কোন সভায় বক্তৃতা দিতে উঠলে তাঁর মৃদুকণ্ঠের বাণী অধিকাংশ শ্রোতার কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছত না। রবীন্দ্রনাথের ভবনে "বিচিত্রা" সভার হলঘরে ও অন্যত্র তিনি মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ কথাই আমরা শুনতে পাই নি। ছোট ছোট ঘরে বৈঠকী আলোচনাতেই তাঁর সংলাপ জমে উঠত চমৎকার।

ফরাসী সাহিত্য ছিল তাঁর নখদর্পণে, তাই প্রায়ই আলোচনা করতেন ফরাসী চিন্তাশীলদের মতামত নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের উপরে ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা— কোন শিষ্যও কোন গুরুকে তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতে পারে না, অথচ তাঁর রচনা-পদ্ধতির উপরে রবীন্দ্রনাথের যৎসামান্য প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচনার বিশিষ্টতা দেখে একাধিকবার উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন দান করেছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দেই তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, 'এইবার সাহিত্যের সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

একবার "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথের একটি গান প্রকাশিত হয়, তার গোড়ার দিকে আছে : 'একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে, বসেছ যে ফুলসাজে, সে কথা যে গেছ ভুলে।' প্রমথবাবু প্রশংসাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'একটি সম্পূর্ণ ফরাসী ছন্দ নিয়ে কবি এমন নিখুঁত কৌশলে বাংলা গানে ব্যবহার করেছেন যে, দেখলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ফরাসী পদ্যবন্ধের মিলের পদ্ধতিটুকুও কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু বাঙালী পাঠকরা গড়্ গড়্ ক'রে পড়ে যাবে, আসল টেকনিকের কোন রহস্যই উপলব্ধি করতে পারবে না।'

প্রমথবাবু ফরাসী ছন্দটির নামও বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি।

পনেরো

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তিনজনের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন হাসির গান, জাতীয় সঙ্গীত ও নাটকের উপরে। তাঁর খ্যাতির ভিত্তিও ঐ তিন বিভাগেই। "মন্দ্র" ও "আলেখ্যে"র কবি রূপে তাঁকে চেনে কম লোকই।

অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ নিছক গীতি-কাব্যকার। একাধিক সাহিত্য বৈঠকে তখন প্রায়ই প্রশ্ন উঠত, ওঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কবি কে? বরাবরই আমি সংশয়শূন্য চিত্তে উত্তর দিয়েছি, দেবেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে আজও আমি নিঃসন্দেহ। কারণ বলি।

যথাসময়েই বলা হয়েছে, অক্ষয়কুমারের রচনার উপরে বিহারী-লালের অল্পবিস্তর প্রভাব শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল ও দেবেন্দ্রনাথ যতটা নিজস্ব ষ্টাইলের পরিচয় দিয়েছেন, আর কোন কবিই ততটা পারেন নি। বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়েও দেবেন্দ্রনাথ এদিকে অধিকতর অগ্রসর। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা তাঁর মুখে সর্বদাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, অথচ তাঁর রচনার কোথাও নেই রবীন্দ্রনাথের তিলমাত্র প্রভাব। স্বাক্ষর না থাকলেও দেবেন্দ্রনাথের যে কোন কবিতাকেই চিনতে পারা যায়।

দেবেন্দ্রনাথের ছন্দবৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট, এদিক দিয়ে অক্ষয়কুমার

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। দেবেন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় দার্শনিকতা আছে বটে, কিন্তু সুমধুর কাব্যরসের মধ্যে তার পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। অক্ষয়কুমারের দার্শনিকতা প্রায়ই কাব্যরসকে চাপা দেবার চেষ্টা করে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা সুযোগ পেলেই হাস্যময়ী হ'তে চায়, কিন্তু অক্ষয়কুমারের কবিতার মুখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুগম্ভীর। বিষয়বৈচিত্র্যেও দেবেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ, যদিও মিলের দিক দিয়ে তিনি অক্ষয়কুমারের চেয়ে দুর্বল।

অক্ষয়কুমারের কবিতা অধিকতর মার্জিত ও সুশৃঙ্খল বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মত তা স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে মনে হয় না, এখানে ওখানে চেষ্টার লক্ষণও আছে। সব চেয়ে অবাক হ'তে হয় দেবেন্দ্রনাথের ভূরি ভূরি উপমার বাহার দেখে। রবীন্দ্রনাথ উপমার রাজা, কিন্তু উপমায় এত নূতনত্ব তিনিও দেখাতে পারেন নি। কেবল তিনি কেন, আর কোন বাঙালী কবিও নন। অন্য কোন কবির হাতে পড়লে যে সব উপমা একেবারে উদ্ভট ও উপহাস্য হয়ে উঠত, তাদের নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ নিজের কাব্যের আসর এমন জমিয়ে তুলেছেন যে, দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তার উপরে ছোট ছোট আটপৌরে সাদাসিধে শব্দের সাহায্যে হাসিখুসির ভিতর দিয়ে তিনি যে সব ঘরোয়া ছবি এঁকে গিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনাই নেই। সময়ে সময়ে তাঁর হাসির ভিতরেও থাকে জমাট অশ্রু। আর এক বিষয়ে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য দেখা যায়। অক্ষয়কুমারকে দুঃখের কবি বললে অন্যায় হবে না; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আনন্দের কবি, হাসির কবি, আলোর কবি।

দেবেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে ওকালতি করতেন এবং মক্কেল-মহলে তাঁর পসার ছিল যথেষ্ট। আইনের সঙ্গে কবিতার যোগসূত্র

কোথায় আছে জানি না, কিন্তু বাংলাদেশে গত যুগের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গেই কোন না কোন দিক দিয়ে আইনের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। যেমন মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি। দেবেন্দ্রনাথ যখন মকদ্দমার নথিপত্র ঘাঁটতেন না, তখন করতেন কবিতা রচনা। "অশোকগুচ্ছ", "গোলাপগুচ্ছ", "শেফালীগুচ্ছ" ও "পারিজাতগুচ্ছ" প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যপুস্তক সেই সাধনার ফল। এক "অশোকগুচ্ছ" পাঠ করলেই দেবেন্দ্রনাথের কবিত্বের সমস্ত বিশেষত্বের সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত হওয়া যায়। গদ্যেও তাঁর হাত ছিল যে সুদক্ষ, সে প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু গদ্য নিয়ে তিনি বেশী নাড়াচাড়া করেন নি। অজস্র কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে ফরমাজী ও বাজে কবিতার সংখ্যাও অল্প নয় বটে, কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যে আছে পরম উপভোগ্য আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ কবি-চিত্তের আত্মপ্রকাশ। শেষের দিকে তাঁর কবিতার মধ্যে ধর্মভাবই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

বলরাম দে (এখন ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি) স্ট্রীটের উপরে দেবেন্দ্রনাথ একটি বিখ্যাত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তার নাম "শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা"। তিনি কলকাতায় এসে সেইখানে বাস করছেন শুনে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। সে বোধ হয় চল্লিশ কি একচল্লিশ বৎসর আগেকার কথা।

গিয়ে কি দৃশ্য দেখলুম! তিনতলার ছোট্ট একটি ঘরের ভিতরে ছোট্ট একখানি চৌকীর উপরে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ কবি—হাতে বাত, পায়ে বাত, সর্বাঙ্গে বাত, প্রায় পক্ষাঘাতের রোগীর মত পঙ্গু! চোখে বিষম পুরু কাঁচের চশমা, দৃষ্টিশক্তি প্রায় অন্ধের মত ক্ষীণ, ভীষণ রোগযন্ত্রণা; কিন্তু প্রসন্ন মুখে তার কোন চিহ্ন নেই, কোন

অভিযোগ নেই— নির্বিকারভাবে মুখে মুখেই রচনা ক'রে যাচ্ছেন শ্লোকের পর শ্লোক এবং কাগজ-কলম নিয়ে ব'সে আর একজন তা লিখে নিচ্ছেন। সারা মন আমার বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এমন অবস্থায় যে রচনাকার্য— বিশেষতঃ কাব্যরচনা চলতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না।

তাঁর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে সেই ঘরখানি আমার কাছে হয়ে উঠল তীর্থক্ষেত্রের মত। দিনের পর দিন প্রায় প্রতিদিনই তাঁর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতুম এবং সর্বান্তঃকরণ দিয়ে উপভোগ করতুম দারুণ রোগযন্ত্রণায় পরম অবিচল সেই সাধক কবির কাব্যগুঞ্জন ও সাহিত্যের বাণী। তাঁর মনের উপরে দেহের কোন প্রভাবই ছিল না।

মৃত্যুশয্যাশায়ী রজনীকান্তের অসাধারণ ও অনাহত কাব্যসাধনা দেখে বিস্মিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্রে তাঁকে যে কথাগুলি লিখেছিলেন, এখানে তা স্মরণ হচ্ছে: 'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম।··· কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশীর ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য!'

তেতলার ছাদের সেই কুঠরির মধ্যে কবির সঙ্গে দেখা করতে আসতেন প্রত্যহই বহু সাহিত্য-সেবক। আমার মত নিয়মিতভাবে আসতেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর আসতেন শ্রীমোহিতলাল মজুমদার— কাব্যচর্চা সুরু করলেও তখনও তিনি কবি রূপে বিখ্যাত হন নি। আর একজনও প্রতি বৈকালে হাজিরা দিতেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক (এবং পরে ভারতী বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠাতা) স্বর্গীয় ভবতারণ সরকার। একদিন রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন, কিন্তু আমি সেদিন উপস্থিত ছিলুম না ব'লে দুই কবির সম্ভাষণ শোনবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলুম। দেবেন্দ্রনাথের উপরে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত, তাই তিনি নিজের বিখ্যাত কবিতাপুস্তক "সোনার তরী" তাঁর নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় পাঁচ বৎসর ও অক্ষয়কুমারের চেয়ে প্রায় দশ বৎসর বড় ছিলেন।

প্রায় প্রতিদিনই আসতেন বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকরা। সাক্ষাৎ বা আলাপ করতে নয়, কবিতা ভিক্ষা করতে। এমনি ছিল দেবেন্দ্রনাথেব দাক্ষিণ্য, কারুকেই ফিরতে হ'ত না শূন্যহস্তে। ব্যাধির তাড়না, শয্যা থেকে উঠতে বা নিজে কলম ধরতে পারেন না, তবু কোনদিন তিনি কোন সম্পাদককেই হতাশ করেন নি, নগণ্য পত্রিকার জন্যেও মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে দিয়েছেন। তাগিদ মেটাবার জন্যে এই শ্রেণীর রচনা যে বিশেষভাবে উৎরে যেত না সে কথা বলাই বাহুল্য।

দেবেন্দ্রনাথের আর একটি মহৎ গুণ, তাঁর মনে ছিল না ঈর্ষার নামমাত্র। কতদিন তাঁর কাছে গিয়েছি এবং কোনদিনই তিন-চার ঘণ্টার আগে তাঁর কাছ ছেড়ে নড়ি নি, কিন্তু কখনো তাঁকে ঘৃণাক্ষরেও অন্য কোন কবিদের নিন্দা করতে শুনি নি।

তিনি কুৎসা করতেনও না, কুৎসা শুনতেনও না। সর্বদাই প্রশান্ত ও প্রসন্ন মনে বিরাজ করতেন নিজের কাব্য-তপোবনে। তাঁর বৈঠক ছিল যথার্থ সাহিত্যের বৈঠক। সেখানে ভাবের আদান-প্রদান চলত তর্কাতর্কির উত্তাপের ভিতর দিয়ে নয়, সখ্য, সদ্ভাব ও সম্প্রীতির ভিতর দিয়ে। এমন বৈঠক আজকাল তো আর দেখি না।

ছেলেবেলা থেকেই মাঝে মাঝে কবিতা রচনার চেষ্টা করেছি, তখনও করতুম। একদিন দেবেন্দ্রনাথকে একলা পেয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁকে আমার একটি কবিতা শুনিয়ে দিলুম। দেবেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'চমৎকার, চমৎকার! Beautiful! হেমেন্দ্র-বাবু, আপনি যে একটি বর্ণচোরা আম! আপনি যে একজন ভালো কবি, সেটা তো আমার জানা ছিল না! আপনার আরো কবিতা আছে? আমার কাছে নিয়ে আসবেন— অসঙ্কোচে!'

ভেঙে গেল আমার লজ্জার বাঁধ। তারপর থেকে দেবেন্দ্রনাথকে একলা পেলেই আমি কবিতা নিয়ে করতুম আক্রমণ। তিনি যত শুনতেন, তাঁর শুনবার ইচ্ছা তত যেন বেড়ে উঠত। সাগ্রহে বলতেন, 'আরো কবিতা আছে? আমাকে শোনাবেন। আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!'

ভবিষ্যৎ যে কতখানি উজ্জ্বল এতদিনে তা আন্দাজ করতে পেরেছি। কিন্তু তখন তা পারি নি ব'লে দ্বিগুণ উৎসাহে কোমর বেঁধে কবিতা রচনায় নিযুক্ত হলুম। রোজই একটি দু'টি ক'রে কবিতা লিখে দেবেন্দ্রনাথকে শুনিয়ে আসি। উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনী নিয়ে একখানি খণ্ডকাব্যও রচনা ক'রে ফেললুম। দেবেন্দ্রনাথ মন দিয়ে সব শুনতেন, আমাকে আরও লেখবার জন্যে উৎসাহ দিতেন এবং অন্য কারুকে কারুকে ডেকে বলতেন,

'হেমেন্দ্রবাবু সুন্দর কবিতা লেখেন, জানেন কি?' কেবল তাই নয়, আমার কোন কোন কবিতার দুই-একটি লাইন মুখে মুখে তিনি পুনরাবৃত্তি করতেও পারতেন।

দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ ক'রে মনের ঝোঁকে লিখে ফেলেছিলুম প্রায় দেড়শত কবিতা। তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র কবিতা "নব্যভারত" ও "অর্চনা" প্রভৃতি মাসিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, বাকি কবিতাগুলি বন্ধ ক'রে রেখেছিলুম দেরাজের ভিতরে। কিছুদিন পরে নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম, সেগুলি প্রকাশযোগ্য বা উল্লেখযোগ্য নয়।

কিন্তু সেই সত্য কি দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন নি? নিশ্চয়ই পেরেছিলেন। তিনি পাকা কবি, জ্ঞানী এবং গুণী। আমার সে কবিতাগুলির অসারতা সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। তবু তিনি আমাকে নিরুৎসাহ করতে চান নি। কারণ তিনি জানতেন বীজে জলসঞ্চার না করলে বীজ পরিণত হয় না চারায়। নূতন লেখকের মনে প্রেরণা সঞ্চার না ক'রে বিরুদ্ধ সমালোচনা করলে ভবিষ্যতে তার সফলতা সম্বন্ধে সংশয় থেকে যায়। নতুন লেখকরা মানুষ হ'তে পারে দেবেন্দ্রনাথেরই মত দরদী শিক্ষকের কাছে।

কবিতাগুলিরও পরিণাম শুনুন। মমতাবশতঃ নিজের হাতের কাজকে সেদিন পর্যন্ত নষ্ট করতে পারি নি। আমি পারি নি, কিন্তু আমার কনিষ্ঠ পুত্র পেরেছে। কবিতা-লেখা কাগজগুলো ইন্ধনের মত ব্যবহার ক'রে ফেলে দিয়েছে উনুনের ভিতরে। কিন্তু সে তো জানে না, দেবেন্দ্রনাথ তাদের ভিতরেই দেখতে পেয়েছিলেন আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে! তবে আমার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে না পারলেও তারা যে অবশেষে উনুনের ভিতরটা উজ্জ্বল করতে পারলে, এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

ষোলো

কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাছে যাঁরা শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিন জনের নাম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

নগেন্দ্রনাথ পরে ছোটগল্পলেখক, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিকরূপে সমধিক খ্যাতি লাভ ক'রে কবিতা লেখা ছেড়ে দেন বটে, কিন্তু পুরাতন "ভারতী" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলি পড়লেই বেশ বোঝা যায়, কাব্যচর্চা না ছাড়লে কবিরূপেও তিনি নিজের পথ কেটে নিতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কবিতাগুলির উপরে বিহারীলালের অল্পবিস্তর প্রভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর বৃহত্তর ও অতুলনীয় প্রতিভা অল্পদিনের মধ্যেই বিহারীলালের প্রভাব থেকে সম্যক্‌রূপে মুক্ত হ'তে পেরেছিল।

কিন্তু অক্ষয়কুমার তা পারেন নি। তাঁর শেষের দিকের রচনাতেও আংশিক ভাবে বিহারীলালের সুর, ছন্দ ও লিখনভঙ্গী প্রভৃতি আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, পূর্বোক্ত তিন কবির আর একজন সতীর্থ ছিলেন, তিনি বিহারীলালের বড় ছেলে অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনিও চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন এবং তাঁর কয়েকটি কবিতা "ভারতী"তে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফুটতে ফুটতেও ফুটলেন না। মস্তিষ্কের ব্যাধি তাঁর কাব্যানুশীলন ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল।

অক্ষয়কুমারের জন্ম ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। হেয়ার স্কুলের পাঠ শেষ করবার আগেই তিনি অফিসে কেরাণীগিরি করতে বাধ্য হন। পুরাতন "বঙ্গদর্শন" ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর রচিত কবিতা সাদরে গৃহীত হ'ত। "প্রদীপ", "কনকাঞ্জলি", "ভুল", "রজনীর মৃত্যু", "এষা" ও "শঙ্খ" নামে তাঁর কয়েকখানি কবিতা-পুস্তক আছে। বাংলা দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত কবিই গদ্য রচনার নমুনাও রেখে গিয়েছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার কোনদিনই গদ্যে হাত দেন নি।

বিহারীলালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়াতে না পারলেও তাঁর যে নিজস্ব রচনাভঙ্গী, স্বকীয় কাব্য-বৈভব ও গভীর ভাবসম্পদ ছিল, একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। যে সঙ্গীত কানে শোনা যায় না, যে সঙ্গীত প্রাণে অনুভব করতে হয়, তাঁর কবিতার মধ্যে তারও অভাব ছিল না। তিনি জাতকবি। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নামের মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে না। যদিও রবীন্দ্রনাথের মত জীবনকে তিনি সব দিক দিয়ে সমগ্রভাবে দেখতে পারেন নি এবং যদিও তাঁর শব্দসম্পদ ও ছন্দবৈচিত্র্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ও আধুনিক যুগের উপযোগী নয়, তবু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের অধিকাংশ কবির চেয়ে তিনি উচ্চাসনের দাবি করতে পারেন।

অক্ষয়কুমারের সব বই একসঙ্গে বাঁধিয়ে রাখলেও আকারে বৃহৎ হবে না। তাঁর সাহিত্য-শ্রম স্মরণীয় নয়। তিনি তাড়াতাড়ি বা খুব বেশী লিখতে পারতেন না। অনেক দিন অন্তর তাঁর এক একটি কবিতা জন্মলাভ করত। তিনি চিন্তা করতেন বেশী, কলম ধরতেন কম। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি, কখনো কখনো একটিমাত্র কবিতা রচনা করতে তাঁর কেটে গিয়েছে দিনের পর দিন। মাঝে

মাঝে বলেছেন, 'একটা নতুন কবিতা ধরেছি, কিন্তু শেষ করতে পারছি না।' তখন তাঁর মুখ দেখলে বোঝা যেত মনে মনে তিনি কষ্টভোগ করছেন। অনেক মাসিক পত্রিকার ছিনেজোঁক গোছের ছুঁদে সম্পাদকও বারংবার তাঁকে আক্রমণ ক'রে তাঁর কাছ থেকে একটিও কবিতা আদায় করতে পারেন নি। তাগাদা বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে কখনো তিনি লেখনী ধারণ করেছেন ব'লে মনে হয় না। কবিতা স্বয়মাগতা হ'লেই তাঁর প্রাণে জাগত রচনার জন্যে প্রেরণা। তাই ভারে নয়, ধারে কাটে তাঁর কবিতা। সেগুলির সংখ্যা বেশী নয় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর বস্তু নেই বললেও চলে।

"অর্চনা" মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে প্রত্যহ আমাদের একটি সান্ধ্য বৈঠক বসত। সেইখানেই তাঁর প্রথম দেখা পাই, যদিও তাঁর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বাল্যকাল থেকেই। এক-হারা, ছিপছিপে দেহ, প্রায় গৌরবর্ণ, মুখশ্রী বিশেষ উল্লেখ্য বা তীক্ষ্ণধীজ্ঞাপক নয় বটে, কিন্তু মনে কোন বিরাগও জাগায় না। তবে কবিতা প'ড়ে কবির যে মূর্তি কল্পনা ক'রে নিয়েছিলুম, আসল মানুষটির সঙ্গে তার মিল হ'ল না। এই রকমটাই হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের মত কবি-চেহারা এদেশের কোন কবিই লাভ করেন নি। আমি যে সব বিখ্যাত মৃত কবিকে স্বচক্ষে দেখেছি— যেমন অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি— তাঁদের কারুর চেহারাই কবি-জনোচিত নয়। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরী সম্বন্ধে এমন কথা বলা চলে না।

অক্ষয়কুমার বেশ সদালাপী ও মিশুক মানুষ ছিলেন। সাদা-সিধে সাজ-পোষাক। প্রকৃতিটি নিরীহ। তাঁকে অহমিকা প্রকাশ করতে বা খুব জোর দিয়ে কোন কথা বলতে শুনি নি। প্রায়ই

সন্ধ্যার মুখে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তেন, তারপর গিয়ে বসতেন বিভিন্ন সাহিত্য বৈঠকে। সাহিত্য-সম্পর্কীয় আলোচনায় যোগ দিতেন বটে, কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, অমৃতলাল বসু, প্রমথ চৌধুরী বা শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের মত সংলাপে বিশেষ শক্তি বা সাহিত্যরসের পরিচয় দিতে পারতেন না। যখনই ওঁদের কাছ থেকে ফিরে এসেছি তখনই মনে হয়েছে, আজ কোন নূতন কথা শুনে বা শিখে এলুম। অক্ষয়কুমারের কাছে গিয়ে কোনদিন তা মনে হয় নি।

"সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র ছিলেন রীতিমত কটুভাষী সমালোচক। কিন্তু কোনদিন তিনি অক্ষয়কুমারের নাম নিয়ে কালির ছিটে ছড়ান নি। হয় তো তার অবসরও হয় নি, কারণ অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হ'ত "সাহিত্য"-পত্রিকাতেই। সুরেশচন্দ্রকেও মাঝে মাঝে "সাহিত্য"-গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বাড়ীতে এসে আলাপ জমিয়ে যেতে দেখেছি। তিনি অক্ষয়কুমারের নাম দিয়েছিলেন "বড়াল-কবি"।

অক্ষয়কুমারের মুখে নতুন বাংলার গীতি-কাব্যগুরু বিহারীলালের কোন কোন গল্প শুনেছি। ভাবে-ভোলা সদানন্দ পুরুষ, সর্বদাই কাব্যরসে মসগুল হয়ে আছেন। নতুন নতুন গান বাঁধেন, সুর দিয়ে গাইতে গাইতে দুই হাতে তক্তাপোশ চাপড়াতে চাপড়াতে তাল দেন। কিন্তু কেউ বিয়ের কবিতা ফরমাস করলেই মহা-ক্ষাপ্পা, লাঠি নিয়ে পিছনে তাড়া করেন।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের একটি বিশেষ দুর্বলতা প্রায়ই লক্ষ্য করেছি। যদিও এ দুর্বলতা তিনি যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু গোপন করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের উপরে তিনি মনে

মনে খুসি ছিলেন না। এর কারণ অনুমান করাও কঠিন নয়। তিনিও রবীন্দ্রনাথের সতীর্থ, একই গুরুর কাছে হাত মক্স করেছেন, অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কত পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন! সহ-শিল্পীর এই ঈর্ষা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এথেকে সাহিত্যক্ষেত্রে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে বহু আবর্জনাই। এই ঈর্ষার দ্বারা চালিত হয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ্যে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ। অক্ষয়-কুমারের অতটা সাহস ছিল না। কিন্তু যে সব বৈঠকে ঘটা ক'রে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে ধূলো-কাদা ছোঁড়া হ'ত, তিনি সেই সব স্থানে হাজিরা দিতে ভালোবাসতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বৈঠকে আমি কত লোককে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কত অমূলক কথাই বলতে শুনেছি! কেউ বলতেন, তিনি সংস্কৃত না জেনেও জানবার ভান করেন, কেউ বলতেন, তিনি ইংরেজী লিখতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমারকে এরকম মন্তব্য প্রকাশ করতে শুনি নি বটে, কিন্তু একাধিকবার বলতে শুনেছি: 'দেখ, রবিবাবু যে ভালো ভালো কবিতা লিখেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এত বেশী বাজে কবিতাও লিখেছেন সাহিত্যের মধ্যে সেগুলির স্থান হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের মত বাজে কবিতা লেখেন নি এবং সেইজন্যেই বেশী কবিতা লেখার পক্ষপাতী নন। বেশী লিখলেই বাজে লিখতে হয়।

কিন্তু অক্ষয়কুমার কোনদিন বোধ হয় এ হিসাব ক'রে দেখেন নি যে, রবীন্দ্রনাথ এমন অসংখ্য শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছেন, যার তুলনায় তাঁর নিজের জীবনব্যাপী সাহিত্যশ্রমের দান মুষ্টিমেয় ব'লেই গণ্য হ'তে পারে।

অক্ষয়কুমারের মুখেই বঙ্কিম-যুগের একটি গল্প শুনেছি। কবি নবীনচন্দ্র সেনের সামনে কেউ রবীন্দ্রনাথকে বড় কবি বললে তিনি

আঘাত পেতেন না। কিন্তু কেউ যদি হেমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠতর কবি বলত, তা'হলে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন।

ঠিক এই দুর্বলতা ছিল অক্ষয়কুমারেরও। রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর কবি বললে তাঁর মন হ'ত বিরস। কিন্তু যে আসরে সবাই দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রশস্তি নিবেদন করতে ব্যস্ত, সেখানে তিনি প্রায়ই নির্বিকার চিত্তে উপস্থিত থাকতেন, রবীন্দ্রনাথের কুৎসা শ্রবণ করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠতা বা অপকৃষ্টতা নিয়ে তিনি কিছুমাত্র মাথা ঘামাতেন না। বড় অদ্ভুত শিল্পীর ঈর্ষা!

সতেরো

আগে সুধীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি, আগে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও হয় নি, আগে তাঁর নামের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

বর্তমান যুগের পাঠকরা খুব সম্ভব "সাধনা" পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত নন। কেউ কেউ বড় জোর তার নাম শুনে থাকতে পারেন। আকার ছিল তার সাধারণ কেতাবের মত। এখনকার অনেক পত্রিকার মত আকারে সে 'মস্ত ডাগর' না হলেও "সাধনা" হয়ে আছে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে 'ল্যাণ্ড-মার্ক' বা ক্ষেত্রসীমা-চিহ্নের মত— যেমন হয়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন"। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা যখন সিদ্ধির সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে, সেই সময়েই "সাধনা"র আত্মপ্রকাশ। সুতরাং "সাধনা" নামটি হয়েছিল রীতিমত যুক্তিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তার প্রধান লেখক, মাসে মাসে সব্যসাচীর মত "সাধনা"কে তিনি সাজাতেন কবিতা দিয়ে, গল্প দিয়ে, প্রবন্ধ দিয়ে, সমালোচনা দিয়ে— এমনকি অনুবাদ দিয়েও। "সাধনা"র মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে তাঁর তৎকালীন সাহিত্যশ্রমের বিচিত্র ইতিহাস। কিন্তু কেবলই কি রবীন্দ্রনাথ? ঠাকুরবাড়ীতে ছিলেন আর এক বিস্ময়কর সাহিত্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর— যাঁর প্রতিভাপদ্ম সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হবার আগেই খ'সে পড়েছে ঝোড়ো বাতাসে। "সাধনা"তে তিনিও নিয়মিত লেখনীচালনা করতেন। যেমন সঙ্গীতময় ও ছন্দসুন্দর ছিল তাঁর ভাষা, তেমনি অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর বিষয়বস্তু— তাঁর

বিভাগে বাংলাসাহিত্যে তিনি কেবল অতুলনীয় নয়, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার উপরে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখনও তিনি শিল্পাচার্য হন নি— তুলি ও কলম নিয়ে খেয়ালের খেলা সুরু করেছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবি "লিথোগ্রাফ" বা শিলাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে "সাধনা"র পৃষ্ঠাকে করত অলঙ্কৃত।

বাল্যকালে "সাধনা" আসত আমাদের বাড়ীতে। সেই "সাধনা"র উপরে দেখতুম সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। তখন জানতুম না সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে। কিন্তু তখন থেকেই আমার কাছে তাঁর নামটি লাগত ভারি মিষ্টি। Presentiment?

আরো বড় হয়ে সুধীন্দ্রনাথের দু-একটি রচনা পড়তুম। তারপর "সাহিত্য" পত্রিকায় দেখলুম মাথায় "ফেয্" টুপী পরা তাঁর একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি। সুন্দর মৌখিক শ্রী— দেখলেই আকৃষ্ট হয় দৃষ্টি।

এখনকার সাধারণ পাঠকরা বলেন্দ্রনাথকে ভুলেছেন, সুধীন্দ্রনাথকেও ভুলেছেন। য়ুরোপে জন্মালে বলেন্দ্রনাথ জনসাধারণের মধ্যেও অমর হয়ে থাকতেন, কারণ তিনি গল্পলেখক না হ'লেও তাঁর রচনাগুলি ছিল গল্পের মতই উপভোগ্য। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ নিজের দেশে এর মধ্যেই প্রায় অপরিচিত হয়ে উঠলেন কেন, এ রহস্য বুঝতে পারি না। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন গল্পলেখকই এবং সত্যিকার উচ্চশ্রেণীর গল্পলেখক। তাঁর কোন কোন ছোট গল্প তখনকার সাহিত্যসমাজকে দস্তুরমত মাতিয়ে তুলেছিল— যেমন "কাসিমের মুর্গী"। তাঁর ভাষাও সেকেলে হয়ে পড়ে নি, কারণ তাঁর কলম দিয়ে বেরুতো না অলঙ্কৃত ও পল্লবিত ভাষা, তিনি ব্যবহার করতেন সহজ, সরল, চলতি ছোট ছোট শব্দ। তাঁর

আখ্যানবস্তুও ছিল ঘরোয়া। অথচ বাজারে তাঁর কেতাবের কোন ক্রেতা দেখি না। তাঁর বইগুলিও বোধ করি ছাপা নেই।

সুধীন্দ্রনাথ হচ্ছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা, কবি ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ওকালতিতে পাস করেছিলেন বটে, কিন্তু ওকালতির দিকে কোনদিনই আকৃষ্ট হন নি। আদালতও তাঁর মতন মানুষ চায় না। আদালতে তাঁর মতন মানুষ মানায় না। তাঁর বড় ছেলে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আজ সুপরিচিত।

সুধীন্দ্রনাথ কেবল গল্প নয়, একখানি উপন্যাসও লিখেছেন, কবিতাও লিখেছেন, প্রবন্ধও লিখেছেন। প্রত্যেক কবিতায় পাওয়া যাবে তাঁর নিজস্ব ছাপ। এটিও ঠাকুরবাড়ীর একটি উল্লেখ্য বিশেষত্ব। সাহিত্য নিয়ে বা শিল্প নিয়ে আজ পর্যন্ত ওখান থেকে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের জন্যে কেটে নিয়েছেন নূতন নূতন পথ। রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর ও মহত্তর প্রতিভার প্রভাবে গোটা বঙ্গসাহিত্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে, কিন্তু তাঁর পরিবারভুক্ত কোন শিল্পীই সে প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হন নি।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সব লক্ষণ আছে সুধীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের অন্যতম যে গুণ সাহিত্যশ্রম, সেটা তাঁর মধ্যে ছিল না। ওজন করলে বেশী ভারি হবে না তাঁর গ্রন্থাবলী। কলম ধরবার উৎসাহ জাগত তাঁর কালে-ভদ্রে, কিন্তু নিয়মিতরূপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়ে প্রত্যহ এ-বৈঠকে ও-বৈঠকে গিয়ে ঘোরাঘুরি করবার উৎসাহ ছিল তাঁর যৎপরোনাস্তি। অথচ আসলে বৈঠকী লোক বলতে যা বুঝায়, তিনি সে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। কারণ তিনি গম্ভীর না হ'লেও স্বল্পবাক ছিলেন। কথা শুনতে যত ভালোবাসতেন, কথা বলতে তত্তটা নয়।

তিনি জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন নিশ্চিন্ত আলস্য-বিলাসের মধ্যে পরম আরামে।

এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন অনেকটা বিলাতী কবি এডওয়ার্ড ফিযজেরাল্ডের মত। যে অসাধারণ শক্তিধর না থাকলে পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম আজ পৃথিবীবিখ্যাত হ'তে পারতেন না, চুয়াত্তর বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যেও তিনি একখানি ক্ষুদ্র অনুবাদ-পুস্তিকা ছাড়া আর কোন স্মরণীয় রচনা রেখে গেলেন না! কবিতা রচনার চেয়ে ভালো লাগত তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গ। তিনি ছিলেন থ্যাকারে ও টেনিসন প্রভৃতির সুহৃদ। ফুল, গান ও কাব্যরসের ভিতর দিয়েই কেটে গিয়েছে তাঁর সারাজীবন।

সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা ছিল স্বার্থহীন। পেটের ধান্ধায় কোনদিন তাঁকে কলম ধরতে হয় নি। দেশের বড় বড় সমস্ত পত্রিকার সম্পাদকই সাগ্রহে তাঁর রচনা প্রকাশ করতেন, কিন্তু জীবনে কারুর কাছ থেকেই তিনি লাভ করেন নি একটিমাত্র কপর্দক। আর এ কথাটাও সত্য, সে যুগের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই অর্থের বিনিময়ে কোন পত্রিকায় লেখা দিতেন না। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত রচনার জন্যে প্রণামী পেয়েছেন পরিণত বয়সেই।

সুধীন্দ্রনাথের মত নির্বিরোধী ও অজাতশত্রু সাহিত্যিক বাংলা দেশে আর কেউ আছেন ব'লে জানি না। আগেই বলেছি তিনি বৈঠকে বৈঠকে বেড়াতে ভালোবাসতেন। তখন সাহিত্যিকদের বিভিন্ন দলের ছিল বিভিন্ন বৈঠক। এক বৈঠকধারীদের সঙ্গে আর এক বৈঠকধারীদের মনের মিল, মতের মিল থাকা স্বাভাবিক নয়। অথচ এইসব পরস্পরবিরোধী বৈঠকে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ অনায়াসে মেলামেশা করতেন এবং সব দলই তাঁকে গ্রহণ করত নিজেদেরই একজনের মত।

আমি যখন তাঁর সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হই, তখন আমার বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী হবে না। বলা বাহুল্য, বয়সে আমি তাঁর চেয়ে ছিলুম ঢের ছোট, তবু প্রথম থেকেই তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন পুরাতন বন্ধুর মত। হয় তাঁর বাড়ীতে, নয় কোন বৈঠকে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত প্রায় প্রতিদিনই। অনেক দিন তিনি নিজেই আমার বাড়ীতে এসে দেখা করতেন। ঠাকুর-গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর চেয়ে মিশুক ও নিরভিমান মানুষ আমি আর দেখি নি। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে যখন আলোচনা হ'ত তখন তিনি এমন সাবধানে কথা কইতেন যে, কিছুতেই আন্দাজ করা যেত না, তাঁর আসল নিজস্ব মতামত কি। দলাদলির ভিতরে জড়িয়ে পড়তে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নারাজ। তাঁর মুখে কখনো কারুর নিন্দা শুনি নি। কখনো তাঁকে রাগ করতে বা বিরক্ত হ'তেও দেখি নি। কোন প্রসঙ্গ তাঁর মনের মত না হ'লে তিনি একেবারেই গম্ভীর হয়ে যেতেন।

কারুর মনেই তিনি সাধ্যমত ব্যথা দিতে চাইতেন না। তিনি কোন নতুন লেখায় হাত দেন না কেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'লিখতে আমার ভয় হয় হেমেন্দ্রবাবু!'

—'সে কি সুধীনবাবু!'

—'লেখা সুরু করলে একসঙ্গে দশ-বারোটা গল্প লিখতে হবে।'

—'কেন?'

—'দশ-বারোজন সম্পাদকের কাছে অঙ্গীকার করেছি, নতুন গল্প লিখলেই তাঁকে দেব। তাই মাথায় লেখার প্লট এলেও হাত গুটিয়ে ব'সে থাকি। একজন সম্পাদককে একটা গল্প দিলে কি আর রক্ষা আছে? অমনি বাকি সবাই এসে একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করবেন।'

এ-রকম অদ্ভুত কারণে লেখায় ইস্তফা দিয়েছেন, এমন আর কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি।

কিছুকাল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম হয়েছিল। দু'জনকে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সর্বদাই দেখা যেত একসঙ্গে। এমন দু'জন বিরুদ্ধ-প্রকৃতি মানুষের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা হ'ল কেমন ক'রে, অবাক হয়ে তাই ভাবতুম। একজনের স্বভাব উগ্র, আর একজন পরম শান্ত। একজন মুখর, আর একজন সংযতবাক। একজন অতি চঞ্চল, আর একজন ধীর-স্থির। একজন জোর গলায় নিজের মতামত ব্যক্ত করেন, আর একজন নিজের মতামত কাকপক্ষীকেও টের পেতে দেন না।

একদিন দেখি পথ দিয়ে চলেছেন সুধীন্দ্রনাথ, হাতে তাঁর খাবারের ঠোঙা। তখনও পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ীর কারুর হাতে খাবারের ঠোঙা দেখি নি। বিস্মিত হয়ে সুধলুম, 'আপনার হাতে খাবারের ঠোঙা ?'

হাসিমুখে তিনি বললেন, 'দোকান থেকে আলুরদম কিনে নিয়ে যাচ্ছি।'

—'কেন, আপনার বাড়ীতে কি আলুরদম হয় না ?'

—'হয়, কিন্তু দোকানের মত স্বাদ হয় না।'

—'স্বাদ না হবার কারণ কি ?'

—'বাড়ীর আলুরদমে তো রাস্তার ধূলো পড়ে না !'

গড়ের মাঠের কখনো ফুটবল খেলা দেখেন নি ব'লে একদিন তাঁকে মোহনবাগানের খেলা দেখাবার জন্যে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলুম।

তিনি বিপুল বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, 'একি, এরা খালি পায়ে ফুটবল খেলে !'

—'কেন, আপনি কি তা জানতেন না ?'

—'না। আমি জানতুম ওরা মোজা প'রে খেলে।'

তাঁর বইগুলির ছাপাই ও বাঁধাই প্রভৃতি যাতে দৃষ্টি-আকর্ষক হয়, সে সম্বন্ধে তিনি থাকতেন অত্যন্ত সচেতন। নিজে বিশেষ সতর্ক হয়ে বার বার প্রুফ দেখতেন। তবু পাছে ভুল থেকে যায় সেই ভয়ে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক) প্রভৃতিকে আহ্বান ক'রে বলতেন, যে ছাপার ভুল আবিষ্কার করতে পারবে তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে— প্রত্যেকটি ভুলের জন্যে এক টাকা। কিন্তু এমনি ছাপাখানার ভুতের মহিমা যে, এতখানি সাবধানতার পরেও পুস্তক প্রকাশিত হ'লে দেখা যেত তার মধ্যে মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে একাধিক !

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রসঙ্গে একপদ সুধাকৃষ্ণ বাগচীর গল্প বলেছি। একদিন পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে গিয়ে দেখি এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। ঘরের মেঝেয় পাতা কাঠের পাটাতনের উপরে খঞ্জ সুধাকৃষ্ণের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন— রাগ করে নয়, সখ ক'রে। তারপর দু'জনেই জড়াজড়ি ক'রে পাটাতনের উপর থেকে দুম ক'রে পপাতধরণীতলে।

সুধাকৃষ্ণ তখন প্রায় বালক আর সুধীন্দ্রনাথ প্রায় বৃদ্ধ। প্রাচীন বয়সেও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুসুলভ মন নিয়ে অনেক মজার গল্প প্রচলিত আছে। বোধ করি পুত্র সুধীন্দ্রনাথও লাভ করেছিলেন সেই মনের খানিকটা।

আঠারো

কিছুকাল আগে শ্রীরাজশেখর বসু মত প্রকাশ করেছিলেন, 'সিনেমাওয়ালীরা দেবীর জাত মেরে দিয়েছে।' আজকাল সাধারণ রঙ্গালয়ের কোন কোন অনধিকারিণীকেও দেবীত্বের উপরে এমনি দাবি করতে দেখা যাচ্ছে। তারাসুন্দরীও সমাজ-বহির্ভূত সমাজের কন্যা, কিন্তু 'দেবী' পদবীর উপরে দাবি করেন নি কোনদিন। ব্যবহার করতেন 'দাসী' পদবীই।

কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর তো জাত-বেজাত নেই। ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক সম্মান থেকে বঞ্চিত হ'লেও, নিজের নিজের ধ্যানের জগতে তাঁরা যখন সমাহিত হয়ে থাকেন, তখন তাঁদের অভিনন্দন দেন গোঁড়া সমাজপতিরাও, তখন তাঁদের ললাটের উপরে পবিত্র করকমল স্থাপন করেন কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী পরমহংসদেবও।

বিপিনচন্দ্র পালের প্রসঙ্গে আগেই বলেছি, তারাসুন্দরীর অসামান্য নাট্যনৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি স্বসম্পাদিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকার জন্যে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে একটি প্রশস্তিপূর্ণ সচিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একাধিকবার আমাদের কাছে বলেছিলেন, 'তারাসুন্দরীর আশ্চর্য প্রতিভা। ওঁর ওপরে একটি কবিতা রচনার ইচ্ছা আছে।' কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি, হঠাৎ অকালেই তাঁকে মহাপ্রস্থান করতে হয়েছিল।

বালক বয়সেই তারাসুন্দরীর নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম বটে, কিন্তু তাঁর অভিনেত্রীরূপ দেখবার আগেই আমি পেয়েছিলুম

কবিতা রচয়িত্রী তারাসুন্দরীর পরিচয়। এ কথা অনেকেই জানেন না যে, তারাসুন্দরী প্রথম যৌবনে কবিতা রচনা করতেন। গত যুগের আর এক বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীও ছিলেন কবি। এবং গদ্যেও তিনি রচনা ক'রে গিয়েছেন আত্মজীবনী।

১৩০২ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত "সৌরভ" নামে একখানি মাসিক কাগজ প্রকাশ করেছিলেন, তার সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। "সৌরভে" বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর দুটি কবিতা প্রকাশ করবার সময়ে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন : 'অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে আমার পুত্র-কন্যার মত সন্দেহ নাই। তাহাদের গুণগ্রাম অপ্রকাশিত থাকে, আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।'

"সৌরভে"র দুই সংখ্যায় তারাসুন্দরীর দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়— "প্রবাহের রূপান্তর" এবং "কুসুম ও ভ্রমর"। কবিতা দুটি আমি পড়েছি। পঞ্চান্নো বৎসর আগেকার দিনে অধিকাংশ সুপরিচিত কবিও তার চেয়ে ভলো কবিতা রচনা করতে পারতেন না। "সৌরভ" দীর্ঘজীবী হ'লে তারাসুন্দরীর কাব্যসাধনা অধিকতর অগ্রসর হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার পরমায়ু হয়েছিল মাত্র তিন মাস।

কাব্যরস বা সাহিত্যরসের অনুশীলন করবার শক্তি না থাকলে কোন অভিনেতাই উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হ'তে পারেন না। গুরুদত্ত শিক্ষা তোতাপাখীর মত আউড়ে আউড়ে অভিনেতা বড় জোর চলনসই ব'লে গণ্য হ'তে পারেন, কিন্তু তার বেশী আর কিছুই নয়। কার্লাইল বলেছেন : যিনি কাব্য রচনা করেন তিনিই কেবল কবি নন, যিনি কাব্য পাঠ করেন তাঁকেও হ'তে হবে কবি। তেমনি রঙ্গমঞ্চের উপরে কাব্যকে ফুটিয়ে তোলাই যাঁদের প্রধান কর্তব্য,

কাব্যরসে বঞ্চিত হ'লে তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন না কোন সৌন্দর্যই। তারাসুন্দরী তা বিশেষ ভাবেই পেরেছেন, কারণ নিজেও ছিলেন তিনি কবি।

অসংখ্য নাটকে আমি তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছি, কিন্তু এখানে একে একে প্রত্যেক ভূমিকার নামের তালিকা দাখিল ক'রে লাভ নেই। তবে আমার মনের মধ্যে বিশেষ ক'রে স্থায়ী রেখাপাত করেছে এই ভূমিকাগুলি: রিজিয়া, আয়েসা (দুর্গেশনন্দিনী), কল্যাণী (প্রতাপাদিত্য), জহরা (সিরাজদ্দৌলা), শৈবলিনী (চন্দ্রশেখর), জাহানারা (সাজাহান), গুলনেয়ার (দুর্গাদাস), ধারা (রাখীবন্ধন), বেগম (অযোধ্যার বেগম), জনা ও উৎপল (কিন্নরী)।

শেষোক্ত ভূমিকা সম্বন্ধে দুই-চার কথা বললে মন্দ হবে না। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের অন্যান্য রচনার সঙ্গে তুলনা করলে "কিন্নরী"র প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু গ্যালারির দেবতাদের লীলাখেলা বোঝা দায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন কোন উৎকৃষ্ট নাটক তাদের মনে ধরে নি, অথচ "কিন্নরী" দেখবার জন্যে মিনার্ভা থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে ভিড় ভেঙে পড়তে লাগল! পালাটির আগাগোড়া ছেলেমানুষিতে ভরা হ'লেও তার দুটি ভূমিকা—উৎপল ও মকরী—ছিল প্রধান আকর্ষণ। আলিবাবার হুসেন ও মর্জিনার মত তাদেরও নাচ-গান ও হাসির কথা দর্শকরা অত্যন্ত উপভোগ করত। উৎপল ও মকরীর ভূমিকা গ্রহণ করতেন যথাক্রমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও চারুশীলা। "কিন্নরী"র জনপ্রিয়তা যখন খানিকটা নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ নৃপেন্দ্রচন্দ্র "মিনার্ভা"র সংস্রব ত্যাগ করলেন।

এবং তারাসুন্দরী পুরুষ বেশে গ্রহণ করলেন উৎপলের ভূমিকা।

সাধারণতঃ তিনি গম্ভীর রসের ভারি ভারি ভূমিকায় অভিনয় ক'রেই তুলনাহীন নাম কিনেছিলেন। ওদিকে নৃত্যে ও 'লো-কমেডি'তে নৃপেন্দ্রচন্দ্রেরও পসার ছিল প্রচুর। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর অভিনয়ের দ্বারা উৎপলের মত নিম্নশ্রেণীর ভূমিকাও কতখানি অসাধারণ ক'রে তোলা যায়, তারাসুন্দরী সেটা সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। গানের সময়ে যে অপূর্ব মৌখিক ভাবাভিব্যক্তি দেখালেন, বাংলা রঙ্গালয়ে তার তুলনা আর পাই নি। নিষ্প্রভ হয়ে গেল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের "উৎপল"। লোকের বিস্ময়ের অবধি নেই। আবার নতুন ক'রে দ্বিগুণ জ'মে উঠল "কিন্নরী"।

বড় নটী ব'লে বিনোদিনীর খুব নাম শুনি। বৃদ্ধা বিনোদিনীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কিন্তু তাঁর অভিনয় আমি কখনো চোখে দেখি নি। তবে গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গম্ভীর রসের ভূমিকায় যত অভিনেত্রীকে দেখেছি, তারাসুন্দরীর স্থান নির্দেশ করতে পারি তাঁদের সকলেরই উপরে। শিল্পী হিসাবে দানীবাবুও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার ও উচ্চারণ ছিল অতি স্পষ্ট, নটের প্রধান যে গুণদুটির উপরে দানীবাবুর দাবি নেই। দানীবাবুর অভিনয় হ'ত একান্তভাবেই 'মেলো-ড্রামাটিক', কিন্তু কি 'মেলো-ড্রামা'য় আর কি বাস্তব নাটকে তারাসুন্দরী সমান দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারতেন। দানীবাবুর আর্টের মধ্যে পাওয়া যেত একটা আন্তরিকতা ও জন্ম-অভিনেতার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতার পরিচয় এবং তারাসুন্দরীর আর্টের মধ্যে আমরা লাভ করতুম আন্তরিকতার সঙ্গে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ক্রিয়াশীল মনীষার প্রভাব।

গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির মত প্রথম শ্রেণীর নাট্যাচার্যের কাছে মানুষ হয়ে তারাসুন্দরীর অভিনয়-শিক্ষার বনিয়াদ রীতিমত পাকা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথমে অর্ধেন্দুশেখর এবং

পরে গিরিশচন্দ্র যখন পরলোক গমন করেন তারপর থেকে দানীবাবু অভিনয়ে আর কোন নূতনত্ব প্রকাশ করতে পারেন নি। "স্টক ইন ট্রেড" থেকে পুরাণো কৌশলগুলিই বারংবার ব্যবহার ক'রে ক'রে হাততালি কুড়িয়ে গিয়েছেন। আর গিরিশ-অর্ধেন্দুর মৃত্যুর পরেও তারাসুন্দরী এমন সব নব নব সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন যে, বেশ বোঝা যেত, তিনি নির্ভর করতেন স্বকীয় মস্তিষ্কের উপরেই।

তারাসুন্দরীর সমসাময়িক অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তিনকড়ি দাসী; তিনি তারাসুন্দরীর চেয়ে দেখতেও সুশ্রী ছিলেন এবং তাঁর গানের গলাও ছিল চমৎকার। কিন্তু তিনি যখন প্রথম রঙ্গালয়ে দেখা দেন তখন ছিলেন নিরক্ষরা। তবু কেবল গিরিশ-চন্দ্রের বিচিত্র শিক্ষার গুণেই তিনকড়ি রীতিমত কঠিন কঠিন ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয়-চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারতেন। তিনকড়ি দ্বারা অভিনীত "জনা"র ভূমিকাটি এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, তাঁর জীবদ্দশায় অনুরুদ্ধ হয়েও তারাসুন্দরী পর্যন্ত তা গ্রহণ করতে সাহসী হন নি।

কিন্তু বহুকাল পরে তারাসুন্দরী যখন প্রাচীনা, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনুরোধে "জনা"র ভূমিকাটি গ্রহণ করেন। শিশিরকুমার তাঁকে শিক্ষা দেন নি, নিজের ধারণার দ্বারাই এই ভূমিকাটি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অনায়াসেই। তিনকড়ির "জনা" দেখেছিলুম আমি বার তিনেক। কিন্তু তারাসুন্দরীর "জনা" হয়েছিল অধিকতর সূক্ষ্ম ও ভাবগভীর। সেই সময়ে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করেছিলুম। বাংলা নাট্যজগতে নবযুগ আসবার পর এখানে অভিনয়ের যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়, পুরাতন যুগের বড় বড় অভিনেতারাও তার

সঙ্গে নিজেদের খাপ্ খাইয়ে নিতে পারতেন না, তাই নূতনদের তুলনায় তাঁরা যথেষ্ট ম্লান হয়েই পড়তেন। কিন্তু তারাসুন্দরীর মনীষা তাঁর মহিমাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ হ'তে দেয় নি, নূতনদের সঙ্গে মিলে-মিশেই নিজের ভূমিকার প্রাধান্য তিনি আগাগোড়া বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

আয়েসা ও রিজিয়ার ভূমিকায় তারাসুন্দরীকে যিনি দেখেন নি তিনি জীবনের একটি প্রধান উপভোগ্য সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। "চন্দ্রশেখর" পালায় কেবল প্রেমিকা শৈবলিনী রূপে নয়, উন্মাদিনী রূপেও তিনি অদ্ভুত অভিনয় করতেন, তারও স্মৃতি কোনদিনই ভুলতে পারব না। "অযোধ্যার বেগমে"ও তিনি নিখুঁত কৌশলে ফুটিয়ে তুলতেন এক অত্যাচারিতা, মহিয়সী মহিলার ছবি। অনূদিত "ওথেলো" নাটকে ডেসডিমোনার ভূমিকায় তিনি বৃদ্ধ বয়সেও লীলাময়ী নব-যৌবনীর মত যে চমৎকার অভিনয় করতেন, তাও ভোলবার কথা নয়।

কিন্তু আর একটি অল্পখ্যাত ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলুম। ইবসেনের "দি ভাইকিংস অ্যাট হেলগেল্যাণ্ড" অবলম্বন ক'রে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "রাখীবন্ধন" নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে তা অভিনীত হয়। এই পালাটির প্রধান নারী ভূমিকা হচ্ছে, ধারা। উক্ত ভূমিকায় তারাসুন্দরীর যে সংযত, স্বাভাবিক ও ভাবাত্মক অভিনয় দেখেছি, তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই। অমর বিলাতী অভিনেত্রী এলেন টেরিও ঐ ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কিন্তু তারাসুন্দরীর অভিনয় যে তাঁর চেয়ে নিরেস হয়েছিল, এমন সন্দেহ আমার হয় না। "রাখীবন্ধনে" চন্দ্রাবতের ভূমিকায় তারক পালিতের চিত্তাকর্ষক অভিনয়ও আমার

মনে আছে। কিন্তু তা সত্বেও "রাখীবন্ধন" দীর্ঘজীবী হয় নি। বাঙালী দর্শক সহজে কাঁচ-কাঞ্চনের পার্থক্য বোঝে না।

বন্ধুবর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাদর আমন্ত্রণে প্রায়ই যখন ষ্টার থিয়েটারের মহলায় হাজিরা দিতুম, সেই সময়েই তারাসুন্দরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন তিনি প্রৌঢ়া। তারপর সুদীর্ঘকাল ধ'রে নানা স্থানে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে বুঝেছি, তিনি ছিলেন অতিশয় ধীমতী। লেখাপড়া যে করতেন, সে পরিচয়ও পাওয়া যেত তাঁর কথা-বার্তায়। আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে যুক্তিযুক্ত মতামতও প্রকাশ করতে পারতেন— নবযুগের অনেক নাম-করা অভিনেতাও যা পারেন না।

তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখে এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি বাংলাদেশের অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে মতপরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি।

তারাসুন্দরী সুরূপা ছিলেন না। কিন্তু সুন্দরী নারীর ভূমিকায় যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সেও নাট্যমঞ্চের উপরে পদার্পণ করতেন, তখন অপূর্ব ভাবাভিব্যক্তির দ্বারা নিজের মুখে-চোখে-দেহে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রপঞ্চ। য়ুরোপেরও অনেক বিখ্যাত অভিনেত্রী এই ভাবে দর্শকদের চোখ ভুলিয়েছেন। সারা বার্নার্ড ও আনা পাবলোভা সুন্দরী ছিলেন না।

উনিশ

দীনেশচন্দ্র প্রথমে বিখ্যাত হন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রচনা ক'রে। এই বৃহৎ ও মূল্যবান গ্রন্থখানি যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তখন বাংলাদেশে যে বিস্ময় ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখনো আমার মনে আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে কত মহার্ঘ রত্নের আকর, দীনেশচন্দ্রই সেদিকে প্রথম আকৃষ্ট করেন বাঙালীর দৃষ্টি। তিনি দরিদ্র ছিলেন, তবু এই সুকঠিন সাহিত্য-ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে দীর্ঘকালব্যাপী যে বিপুল শ্রমস্বীকার করেছিলেন তাও স্মরণ ক'রে রাখবার মত। যথেষ্ট অনিশ্চয়তার মধ্যেই তাঁকে কর্তব্য পালন করতে হয়েছিল ; কারণ এ শ্রেণীর গ্রন্থ যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে লেখকের শ্রম সার্থক করতে পারবে, তখনকার দিনে এ কথা জোর ক'রে বলবার উপায় ছিল না।

"ময়মনসিংহ-গীতিকা"-কেও দীনেশচন্দ্রের আর এক আবিষ্কার বলা যেতে পারে। পরিণত বয়সে "বৃহৎ বঙ্গ" রচনা ক'রেও তিনি বাঙালীর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন তার গৌরবদীপ্ত অতীতকে। প্রধানতঃ এই তিনখানি গ্রন্থের জন্যেই বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি অক্ষয় যশের অধিকারী হয়েছেন। এ ছাড়া "রামায়ণী কথা", "বেহুলা" ও "ফুল্লরা" প্রভৃতি আরো কয়েকখানি জনপ্রিয় পুস্তক তিনি রচনা ক'রে গিয়েছেন।

দীনেশচন্দ্রের রচনাভঙ্গি বা "ষ্টাইল" উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঠাট্টা ক'রে বলতেন, 'দীনেশবাবুর ভাষা এখনো হামাগুড়ি দেয়, হাঁটতে শেখেনি।' কিন্তু তাঁর ভাষার মধ্যে

এমনি মিষ্ট প্রাঞ্জলতা ও আন্তরিকতা আছে, প্রত্যেক পাঠককেই যা আকৃষ্ট না ক'রে পারে না।

প্রথম জীবনটা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পরে তিনি যশ, অর্থ ও রাজসম্মান প্রভৃতি মানুষের যা-কিছু কাম্য, সমস্তই লাভ করেছিলেন, অধিকাংশ সাহিত্য-সেবকেরই এতটা সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু সুখের দিনেও তাঁর স্বভাবের মাধুর্য ছিল সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত।

তাঁর সঙ্গে যেদিন প্রথম পরিচিত হই, আমি তখন একজন অখ্যাত লেখক মাত্র, ছোট ছোট মাসিক কাগজে এবং মাঝে মাঝে দৈনিক "সন্ধ্যা"য় হাতমক্স করি। একখানি মাসিক পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলুম, তারই জন্যে দীনেশচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলুম একটি রচনা-ভিক্ষা করতে। আমার বয়স তখন সতেরো কি আঠারো, দীনেশচন্দ্রের একচল্লিশ কি বিয়াল্লিশ। তিনি তখন তাঁর কাঁটাপুকুরের বাড়ীতে বাস করতেন (শুনেছি সে বাড়ীখানি নাকি গুণগ্রাহী শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান)।

দীনেশচন্দ্র নীচে নেমে এলেন। তাঁর রংটি কালো বটে, কিন্তু প্রশান্ত প্রসন্ন মুখ। চোখে হাসি, ওষ্ঠাধরে হাসি। এমন স্নেহভরে আমার কাঁধে হাত দিয়ে কথা কইতে লাগলেন, যেন তিনি আমার সমবয়সী পুরাতন বন্ধু।

"সাধনা-সমিতি" নামে আমাদের একটি আলোচনা-সভা ছিল—সেখানে আমরা কয়েকজন উদীয়মান সাহিত্যিক স্বরচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করতুম এবং আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ ক'রে আনতুম ; তাঁরা বক্তৃতা দিতেন। সেক্সপিয়ারের ট্রাজেডির সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের পার্থক্য কি তা দেখিয়ে দীনেশচন্দ্র একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

তারও অনেক বৎসর পরে সুকিয়া স্ট্রীটে "ভারতী" কার্যালয়ের

তিনতলায় বসত আমাদের বৃহৎ বৈঠক। বাংলা দেশের প্রবীণ ও নবীন অধিকাংশ বিখ্যাত লেখক ছিলেন সেখানকার সভ্য। প্রতিদিন বৈকাল থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সে বৈঠক গম্‌গম্‌ করত বহু সাহিত্যিকের আনাগোনায়, সাহিত্য-আলোচনায়, তর্ক-বিতর্কে এমন কি মাঝে-মাঝে সমস্বরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও। সেইখানেই দীনেশচন্দ্রকে আমাদের প্রাণের আরো কাছাকাছি পাই। "ভারতী"র সেই বৈঠকে আসতেন প্রমথ চৌধুরী, যাঁর করধৃত সিগারেটের আগুন ছিল রাবণের চিতার ক্ষুদ্রতর সংস্করণের মত সদা-জ্বলন্ত; আসতেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, যিনি গল্প করতে করতে লজেঞ্জুসের মত চুষে চুষে উপভোগ করতেন আফিমের বড় বড় গুলি বা গোলা! আসতেন দীনেশচন্দ্র, তাঁর একমাত্র নেশা চা। আসতেন আরো অনেক দেশবিখ্যাত হোমরা-চোমরা ব্যক্তি, তাঁদের কথা বলব পরে যথাসময়ে। প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র, এঁরা তিনজনেই ছিলেন গল্পিয়া। কিন্তু প্রথম চৌধুরী বলতেন কেবল সাহিত্যের গল্প; আর দীনেশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মুখে শুনতুম আমরা যত রাজ্যের গালগল্প।

বলেছি, দীনেশচন্দ্রের একমাত্র নেশা ছিল চা। কিন্তু সে যা তা চা নয়— একেবারে স্পেশ্যাল চা, "ভারতী"-বৈঠকের 'ইলেকট্রিক কেট্‌লি'তে সে চায়ের জল গরম হ'ত বটে, কিন্তু তার উপাদান ছিল অদ্ভুত। সাধারণতঃ চা তৈরি ক'রে বন্ধুদের মধ্যে পরিবেশনের ভার গ্রহণ করতুম আমি নিজে। দীনেশচন্দ্রের বাঁধা নির্দেশ ছিল, চায়ে কয় চামচ চিনি দিতে হবে তা ব'লে দেবেন তিনিই।

আমি বলতুম, 'দীনেশবাবু, পেয়ালায় তিন চামচ চিনি দিলুম।'

—'আরো চিনি দিন।'

—'চার চামচ, পাঁচ চামচ।'

—'আরো দিন, আরো দিয়ে যান।'

—'ছ চামচ, সাত চামচ হ'ল।'

—'আরো দিয়ে যান, আরো।'

—'বলেন কি দীনেশবাবু, আপনি চা খাবেন, না চিনি খাবেন?'

—'চিনি খাব ভাই, চিনি খাব। চিনি খাব ব'লেই তো চা খাই। আরো চিনি চাই।'

পেয়ালায় আট-দশ চামচ চিনি না পড়লে দীনেশচন্দ্রের মন উঠত না। আরো বেশী চিনি দিলেও তিনি বোধ হয় বলতেন, 'অধিকন্তু ন দোষায়'।

চা এবং চিনিকে যথাস্থানে প্রেরণ ক'রে চাঙ্গা হয়ে ইজি-চেয়ারে ব'সে দীনেশচন্দ্র সুরু করতেন গল্পের পর গল্প। এত রকম গল্প তিনি জানতেন আর এত ভালো ক'রে বলতে পারতেন! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কেটে যেত, খেয়াল করতেই পারতুম না। তারপর তিনি থাকতে থাকতে যে-দিন গালগল্পের আর এক রাজা শরৎচন্দ্র এসে পড়তেন, সেদিন তো হ'ত যাকে বলে 'সোনায় সোহাগা'! এঁর মুখ বন্ধ হ'তে না হ'তে মুখর হয়ে উঠত আর এক জনের মুখ! দস্তুরমত গল্প-প্রতিযোগিতা! মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্র বাক্যবাণের দ্বারা দীনেশচন্দ্রকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করতেন। দীনেশচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বিশেষ ঝোঁক দিয়ে 'my wife' ব'লে নিজের সহধর্মিণীর কথা তুলতেন। একদিন শরৎচন্দ্র বললেন, 'দীনেশবাবু যে রকম দৃঢ়কণ্ঠে 'my wife' ব'লে চেঁচিয়ে ওঠেন, তাতে ক'রে বেশ বোঝা যায় যে তাঁর স্ত্রীর উপর একমাত্র তিনি ছাড়া পৃথিবীর আর কারও একটুখানিও দাবি-দাওয়া নেই!' সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন এবং দীনেশচন্দ্রও কোনরকম অপ্রস্তুত না হয়ে সকলের সঙ্গেই গলা মিলিয়ে হাসতে লাগলেন।

দীনেশচন্দ্র তখন বেহালায় নিজের নতুন বাড়ীতে গিয়ে বাস করছেন। একদিন সেখানে হ'ল আমাদের নিমন্ত্রণ। আমরা মানে স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় "ভারতী"-সম্পাদক ও গল্পলেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও আমি। দীনেশচন্দ্র নিজেও যেমন ভোজনবিলাসী ছিলেন, বন্ধুবান্ধবদের আদর ক'রে খাওয়াতেও তেমনি ভালোবাসতেন। দুপুরবেলায় দেখি আমাদের জঠর-জ্বালা নিবারণের জন্য হয়েছে অপরিমিত আহার্যের আয়োজন। নিজে একসঙ্গে পাত পেতে দীনেশচন্দ্র সকলের উপর রাখলেন শ্যেনদৃষ্টি এবং বারংবার বলতে লাগলেন, এটা খাও, ওটা খাও— পাতে কিছু ফেলে রাখা চলবে না। পূর্ণোদরেও হাত গুটোবার উপায় নেই— 'আরো কিছু নিতেই হবে।' অনিচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর অকাট্য যুক্তি ছিল— 'নইলে আমার স্ত্রী রাগ করবেন!'

কানায় কানায় পেট ভরিয়ে ওজনে রীতিমত ভারি হ'য়ে সকলে বাগানের পুকুড়-পাড়ে ঘাসজমির উপরে এসে বসলুম। দীনেশচন্দ্র স্বরচিত একটি নূতন পৌরাণিক আখ্যায়িকা পাঠ ক'রে শোনালেন। প্রায় একটি গোটা দিন চমৎকার ভাবে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে যখন বিদায় নিচ্ছি, দীনেশচন্দ্র বললেন, 'দেখছেন তো আমি পরম সুখে আছি। সহরের কোন উপসর্গ নেই, নিরিবিলি ঠাঁই, সবুজ বাগান, ফুলের বাহার, পাখীর গান, ঢলঢলে সরোবর— আপনারাও বেহালায় এসে বাসা বাঁধুন না!'

মণিলাল বললেন, 'সবই তো ভালো, তবে ঐ যা ম্যালেরিয়ার ভয়।'

দীনেশচন্দ্র যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'বেহালার মত জায়গা আর নেই। বেহালায় ম্যালেরিয়া? অসম্ভব!'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখানে সাপ আছে।'

দীনেশচন্দ্র বললেন, 'তা আছে। কিন্তু বেহালার সাপরা মানুষদের কামড়ায় না।'

প্রেমাঙ্কুর বললেন, 'বেহালার সাপরা বৈষ্ণব হ'তে পারে, কিন্তু এখানে ভারি শীত, আমি শীতকে ভয় করি।'

দীনেশচন্দ্র বললেন, 'আপনি ঠাণ্ডাকে নিশ্চয় আমার চেয়ে ভয় করেন না। পাছে ঠাণ্ডা লাগে সেই ভয়ে স্নান করা আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। একদিন কি হয়েছিল জানেন? আমার এক ছেলে ডুবে গেল ঐ পুকুরে। কিন্তু আমি সাঁতার জেনেও ঠাণ্ডার ভয়ে পুকুরের জলে নামতে পারলুম না, ডাঙায় দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে পাড়া জাগিয়ে তুললুম। তারপর সকলে ছুটে এসে ছেলেকে জল থেকে টেনে তুললে।'

কিছুকাল পরেই খবর পেলুম, দীনেশচন্দ্র বেহালা থেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে আবার কাঁটা পুকুরের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ? ম্যালেরিয়ার আক্রমণ।

প্রথম দর্শনেই দীনেশচন্দ্রকে যেমন নিকট-আত্মীয় ব'লে মনে হয়েছিল, তারপরও বরাবর তাই ব'লেই মনে হয়েছে। তিনি যেখানেই বসতেন, সৃষ্ট হ'ত যেন একটি প্রেমের আবহ। সদানন্দ মাটির মানুষ ছিলেন তিনি। উত্তেজিত হয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, দু'চারটে কঠিন কথাও বলেছি, কিন্তু তাঁর মুখের হাসি তখনও মিলোয় নি। হয়তো সেইদিনই তাঁর বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছেন। বহু পরশ্রীকাতর ব্যক্তি পত্রিকায় তাঁকে কটু ভাষায় আক্রমণ করেছে, কিন্তু তিনি কখনো কাগজে-কলমে তার উত্তর দেন নি, নীরবে নির্বিকারচিত্তে নিজের সাহিত্যসাধনা নিয়েই নিযুক্ত হয়ে থাকতেন।

বিশ

আমার এই চিত্রশালা কেবল কবি ও অন্যান্য শ্রেণীর শিল্পী প্রভৃতির জন্যে নয়, এর মধ্যে যে কোন অসাধারণ মানুষের ছবি দিতে পারি। আজ আমরা দেখব বিখ্যাত খেলোয়াড় স্বর্গীয় শিবদাস ভাতুড়ীকে।

বাংলায় sport বলতে বুঝায় খেলা বা ক্রীড়াকৌতুক। এখানে জ্ঞানীরা ও-ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দেন না বা দিতেন না এবং জাতীয় জীবনে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতেন না। কিন্তু য়ুরোপীয়দের— বিশেষ ক'রে ইংরেজদের— কথা স্বতন্ত্র। পুরুষোচিত দেহগঠনের তথা জাতিগঠনের পক্ষে উপযোগী ক্রীড়াকৌতুকের অসামান্য সাফল্য তারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে। ইংরেজরা বলে, আমরা ওয়াটারলুর যুদ্ধ জিতেছি ইংলণ্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রেই। তারা জানে, পঙ্গু দেহে সক্রিয় মস্তিষ্কের চেয়ে সক্ষম দেহে সবল মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হচ্ছে বেশী। তাই তাঁরা বড় বড় পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে ডন ব্র্যাডম্যান প্রমুখ খেলোয়াড়দেরও "স্যার" উপাধিতে ভূষিত করতে ইতস্ততঃ করেন না।

ক্রীড়াক্ষেত্রে 'মোহনবাগানে'র অবদান ভারতবর্ষে অমর হয়ে থাকবে। শিবদাস ছিলেন সেই মোহনবাগানের অতুলনীয় মুকুটমণি। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে মোহনবাগান ফুটবল খেলার মাঠে বিখ্যাত একটি ইংরেজ খেলোয়াড়ের দলকে পর্যুদস্ত ক'রে যখন "শীল্ড" লাভ করেছিল, তখন সারা দেশে যে বিস্ময়, আনন্দ ও

উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, এ-যুগের বালক ও যুবকদের কথা ছেড়ে দি, প্রৌঢ়রাও তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। ও ঘটনাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় পলাসীর যুদ্ধের প্রতিশোধের মত। কলকাতার পথে পথে সেদিন যে সব স্মরণীয় দৃশ্য দেখেছি, তা দেখতে পাই নি ভারতের প্রথম স্বাধীনতাদিবসেও।

অতি-বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেহ তাঁর রোগে পঙ্গু। তিনি কারবার করেন সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে, খেলার মাঠে কোনদিন পদার্পণ করেছেন ব'লে শুনি নি। এই অভাবিত সংবাদ শুনে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব'লে উঠলেন, 'বাঃ! আমাদের আজ বড় আনন্দের দিন! বাংলাদেশের ছেলেদের উপর কিছু ভরসা হচ্ছে। এও যে দেখব তা ভাবি নি।.........মনে ক'রে দেখ দেখি যে লাল মুখ দেখলে আমরা ভয়ে আঁৎকে উঠি, বরাবর মনে ক'রে থাকি আমরা চেষ্টা করলে তাদের চেয়ে intellectually বড় হ'লেও হ'তে পারি, কিন্তু বাহুবলে তাদের কাছে কস্মিনকালে এগুতে পারব না— শিখ গোরখা কেবল তাদের কাছে যেতে পারে— সেই জাতের মিলিটারী দলকে খেলায় পরাজিত করা কম কাজ নাকি? একটা ভয়— একটা সঙ্কোচ— যেটা শুধু মনগড়া ছায়া— সেটা দূর হয়েছে। এখন আমরা মনে করতে পারি যে বাহুবলে আমরা তাদের সামনে এগিয়ে যেতে পারি— প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে চেষ্টা করলে তাদের পরাজয় করতে পারি। বাঃ খুব বাহাদুর! বাংলাদেশকে এই খেলায় জিতে দশ বছর এগিয়ে দিয়েছে।'

সেই বিখ্যাত খেলায় নেমেছিলেন মোহনবাগানের এগারোজন খেলোয়াড় এবং প্রত্যেকেরই ক্রীড়ানৈপুণ্য হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু তাঁদের ভিতরে শিবদাস বিরাজ করেছিলেন মধ্যমণির মত।

মোহনবাগানকে বিজয়গৌরবে গরীয়ান করেছিল প্রধানতঃ শিবদাসের প্রতিভাই।

আমি তখন গভর্নমেণ্ট আর্ট-স্কুলে ছাত্র। মার্কাস স্কোয়ারে গিয়ে প্রতিদিন ক্রিকেট-ফুটবল-হকি খেলারও চর্চা করি কিছু কিছু। আমার তখনকার সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মধ্যে ডোঙাবাবু, হাবুলবাবু ও স্বর্গীয় ভূতি সুকুল পরে মোহনবাগানের দলে যোগ দিয়েও যশস্বী হয়েছিলেন (শেষোক্ত দুইজন তো "শীল্ড" বিজয়ী দলেরও মধ্যে ছিলেন)। আর্টস্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার আগে প্রত্যহই গড়ের মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখে আসতুম। সেই সময়ে আমার চোখের সামনেই মোহনবাগান প্রথম "ট্রেড্‌স্ কাপ" লাভ ক'রে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তখনকার দিনে ঐ প্রতিযোগিতার গৌরব ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু মোহনবাগান উপর-উপরি তিন-তিনবার "ট্রেড্‌স্ কাপ" জিতে "চ্যাম্পিয়ন" আখ্যা লাভ করে। তখন তার প্রধান প্রতিযোগী ছিল মেডিকেল মিলিটারি ও ন্যাসন্যাল স্পোর্টিংয়ের দল। প্রথমোক্ত দলটিতে খেলত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা এবং তাদের উইলিয়মস্ নামে এক দীর্ঘদেহ যুবকের নিপুণ খেলা এখনো আমার মনে আছে। শেষোক্ত দলটির সব খেলোয়াড়ই ছিলেন বাঙালী এবং তাঁদের গোলরক্ষক বাঁকাবাবু তখন খুব নামজাদা। 'ন্যাসন্যালে'র আর এক খেলোয়াড় ছিলেন ক্ষেত্রবাবু। ছোটখাটো বেঁটে মানুষটি, কিন্তু তাঁর অগ্রগতি রোধ করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্মরণ আছে, এক বৎসর 'ন্যাসন্যালে'র বিরুদ্ধে উপর-উপরি তিন দিন খেলে মোহনবাগান জয়ী হ'তে পেরেছিল।

কেবল তিনবার "ট্রেড্‌স্ কাপ" জয় করার জন্যে নয়, আর এক বিশেষ কারণে মোহনবাগানের নাম ফিরতে লাগল লোকের মুখে

মুখে। ইংরেজদের অসামরিক দলের মধ্যে তখন সমধিক প্রতাপ ছিল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের। তাকে যে নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত কোন দেশীয় দল হারিয়ে দিতে পারে, এটা ছিল একেবারেই কল্পনার অতীত। কিন্তু মোহনবাগান সেই অসাধ্য-সাধনাই করলে। "মিণ্টো ফেটে"র (fete) এক প্রতিযোগিতায় তার কাছে হেরে গেল ক্যালকাটার দল। কিন্তু মোহনবাগানের দলে একজন বাইরের খেলোয়াড় আছে, এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ সে খেলাটি নাকচ ক'রে দেন।

মোহনবাগানের এই সব বিজয়-যাত্রার অধিনায়ক রূপে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করলেন শিবদাস ভাতুড়ী।

সাধারণতঃ তিনি "লেফ্‌ট লাইনে" খেলতেন। একহারা ছিপছিপে দেহ, বিপুলবপু ইংরেজ প্রতিযোগীদের পাশে কি নগণ্যই দেখাত! কিন্তু বলের উপরে তাঁর যেমন অসামান্য দখল ছিল, তেমনি তাঁর গতিও ছিল অত্যন্ত দ্রুত। প্রতিযোগীদের অনায়াসেই এড়িয়ে একেবারে "কর্নারে"র কাছে গিয়ে তিনি "সেণ্টার" করতেন, নয় বলটিকে এক পদাঘাতে প্রেরণ করতেন "গোলপোষ্টে"র দিকে। "লাইন" থেকে তাঁর মত আর কোন খেলোয়াড়কে আজ পর্যন্ত এত বেশী গোল দিতে দেখি নি— অধিকাংশ খেলাতেই গোল দেবার কৃতিত্ব অর্জন করতেন তিনিই। হয় নিজে গোল দিয়েছেন, নয় সুগম ক'রে দিয়েছেন গোল দেবার পথ। তাঁর আর একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। বেগে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গিয়ে গোলের দিকে বল মেরেই তিনি প্রায়ই হতেন ভূতলশায়ী। হয়তো অতিরিক্ত দ্রুতগতির টাল তিনি সামলাতে পারতেন না।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। "লেফ্‌ট ইনে" অর্থাৎ ঠিক পাশেই তাঁর দাদা বিজয়দাস ভাতুড়ী না থাকলে শিবদাসের

খেলা তেমন খুলত না। দাদার সঙ্গে তাঁর ঠিক মনের মিল ছিল ব'লেই তাঁরা দুজনেই বুঝতেন দুজনের খেলার ধরন ও কৌশল। সামনে বাধা পেলেই দুই ভাই এমন কায়দায় পরস্পরের সঙ্গে বল বিনিময় করতেন যে, প্রতিপক্ষরা দেখত দুই চক্ষে অন্ধকার! বিজয়দাসও একজন সুচতুর ভালো খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের "শীল্ড-ফাইনালে"র ছবি আজও চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু কি অবিশ্বাস্য কষ্ট স্বীকার ক'রেই যে সে খেলা দেখতে হয়েছে! জানতুম মোহনবাগানের নামেই মাঠে জনতার সৃষ্টি হয় এবং "শীল্ডে"র চরম খেলায় সেই জনতা যে বহুগুণ বেড়ে উঠবে, এটাও আমার অজানা ছিল না। বেশ সকাল সকালই মাঠে গিয়ে হাজির হলুম। কিন্তু দেখলুম এক কল্পনাতীত, অসম্ভব দৃশ্য! সমস্ত গড়ের মাঠটা পরিণত হয়েছে জনতাসাগরে, তেমন বিপুল জনতা জীবনে আর কখনো চোখে দেখি নি। খেলার মাঠের দিকেও অগ্রসর হবার কোন উপায়ই নেই। তখন তো গ্যালারি ছিল না, লোকে খেলা দেখত ভাড়া দিয়ে ছয়ফুট থেকে বারো-চৌদ্দ ফুট উঁচু মাচানের উপরে চ'ড়ে। নিতান্ত পল্‌কা বিপদজনক মাচান, প্রায়ই মানুষের ভার সইতে না পেরে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ত— কারুর মাথা ফাটত, কারুর হাত-পা ভাঙত। কিন্তু সে সব মাচানেও আর তিলধারণের ঠাঁই নেই, দ্বিগুণ ভাড়ার লোভ দেখিয়েও একটুখানি পা রাখবার জায়গা সংগ্রহ করতে পারলুম না।

ইডেন গার্ডেনে ফিরে গিয়ে ম্লানমুখে জনকোলাহল শ্রবণ করছি, এমন সময়ে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, তিনি ঐ বাগানের রক্ষক। আমার দুঃখের কথা শুনে তিনি তখনি একখানা লম্বা মই আনিয়ে দিয়ে বললেন, 'দক্ষিণ দিকের একটা দেবদারু

গাছে চ'ড়ে খেলা দেখুন।' অন্য কোন উপায় না দেখে তাই করতে হ'ল।

প্রায় আড়াই তলা উঁচু একটা ডালের উপরে ব'সে সানন্দে দেখলুম, জনতার ফ্রেমে বাঁধানো গোটা খেলার মাঠটি চোখের সামনে প'ড়ে রয়েছে। বাইরের মাঠও মানুষের মাথায় মাথায় কালো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তখনও আসছে জনতার পর জনতার স্রোত। দেখতে দেখতে তুই পক্ষের খেলোয়াড়দের আবির্ভাব, রেফারির বংশীধ্বনি এবং খেলা হ'ল স্থরু।

মোহনবাগানের প্রতিযোগী ইষ্ট ইয়র্কের দল ঠিক বিজেতার মতই প্রবল বিক্রমে খেলতে লাগল, বাঙালীরাও বাধা দিতে লাগল প্রাণপণে। বল একবার ছুটে যায় ওদিকে, আবার ছুটে আসে এদিকে। অবশেষে মোহনবাগানের গোল থেকে বেশ খানিকটা দূরে ইষ্ট ইয়র্ক পেলে একটি "ফ্রি কিক্"। কিন্তু কি দুর্বিপাক! গোলকিপার হীরালালকে এড়িয়ে বল সাঁৎ ক'রে ঢুকে গেল মোহনবাগানের "গোলপোষ্টে"র ভিতরে। বাঙালী দর্শকরা বজ্রাহত। ইংরেজরা প্রচণ্ড আনন্দে উন্মত্ত— চীৎকার করতে করতে কেউ লাফায়, কেউ শূন্যে টুপী ছোঁড়ে, কেউ পায়রা উড়িয়ে দেয়! কালা আদমীর কাছে পরাজয়? কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়—"নেভার, নেভার!"

কিন্তু তার পরেই পাওয়া গেল শিবদাসের অপূর্ব প্রতিভার আশ্চর্য পরিচয়! তিনি যেন মরিয়া, তিনি যেন একাই একশো! তাঁর স্থান যে "লেফ্ট লাইনে" এ কথা আর তাঁর মনে রইল না— কখনো তিনি মাঠের ডানদিকে, কখনো মাঝখানে সকলের পুরোভাগে, কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে, কখনো সেদিকে এবং বলও ছুটছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। সর্বত্রই শিবদাস! সে যেন ইষ্ট ইয়র্ক

বনাম শিবদাসের খেলা! আচম্বিতে শিবদাসের পদ ত্যাগ ক'রে একটি বল উল্কাবেগে ছুটে গেল ইষ্ট ইয়র্কেয় গোলের দিকে এবং তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ গোলকিপার ক্রেসী তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারলেন না।

গোল! গো-ওল্! গো-ও-ও-ল্! বিশাল জনসাগরের সেই গগনভেদী কোলাহল গঙ্গার ওপার থেকেও শোনা গিয়েছিল! আমার পাশের গাছের একটা উঁচু লম্বা ডালে মাথার উপরকার আর একটা ডাল ধ'রে শাখামৃগের মত সারি সারি ব'সেছিল দশ-বারোজন লোক। উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে উপরকার ডাল ছেড়ে তারা দুই হাতে তালি দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে মাটির উপরে গিয়ে অবতীর্ণ হ'ল সশব্দে! তাদের আর্তনাদ শুনতে শুনতে সভয়ে আমি কোঁচা খুলে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজের দেহকে বেঁধে ফেললুম। কি জানি বাবা, বলা তো যায় না, আমারও যদি দৈবাৎ হাততালি দেবার সখ হয়!

মায়াবী শিবদাসের ইন্দ্রজাল তখনও শ্রান্ত হয় নি, তখনও তিনি বল নিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটোছুটি করছেন এখানে ওখানে যেখানে সেখানে! রীতিমত মস্তিষ্কচালনার সঙ্গে সঙ্গে পদচালনা না করলে সে-রকম খেলা কেউ খেলতে পারে না। প্রতিপক্ষদের দশাসই চেহারাগুলো কিছুতেই তাঁর ক্ষিপ্রগামী ছিপ্ছিপে দেহের নাগাল ধরতে পারছে না— যেন তিনি আলেয়া! আবার তিনি হ'লেন গোলের নিকটবর্তী, একজন প্রতিযোগী বাঘের মত তাঁর সামনে এসে পড়ল, কিন্তু তিনি টুক্ ক'রে বলটি তুলে দিলেন নিজেদের 'সেণ্টার-ফরোয়ার্ড' অভিলাষের পায়ের উপরে এবং অভিলাষও কিছুমাত্র ভুল করলেন না!

আবার ইংরেজদের কাণে ভয়াবহ সেই হাজার হাজার কণ্ঠের

আকাশফাটানো জয়ধ্বনি ও করতালি! ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ছাতা ও জুতো! নর্তন এবং কুর্দন! সাহেবদের আসনে সমাধির স্তব্ধতা।

বাজল খেলাশেষের বাঁশী। বাঙালীর প্রথম "শীল্ড" অধিকার। পুরুষোচিত ক্রীড়াক্ষেত্রে কালোর কাছে গোরার প্রথম পরাজয়। তারপরের দৃশ্য বর্ণনাতীত। বাড়ী ফিরেছিলুম সারা সহর মাড়িয়ে, অনেক রাতে।

খেলার মাঠে সেদিন শিবদাসের যে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম, তার তুলনা পাই নি অদ্যাবধি। অবশ্য তার পরে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার ও আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু ক্রীড়কের বিশেষত্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যে, তাই তাঁর মৌখিক ভাষা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই।

একুশ

সেকালের এক ভারতীয় রাজার নাম ছিল অজাতশত্রু। এমন নামের মানে হয় না। কারণ তখন প্রতিবেশী রাজাদের রাজ্য আক্রমণ ক'রে নিজের রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করাই ছিল রাজধর্ম। সুতরাং শত্রু ছিল প্রত্যেক রাজারই।

কিন্তু সাহিত্যজগতে আমি এমন একাধিক ব্যক্তিকে দেখেছি, সত্যসত্যই যাঁদের উপাধি হ'তে পারে 'অজাতশত্রু'। যেমন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যেমন জলধর সেন।

জলধর সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবয়সী। উভয়েরই জন্ম ১২৬৮ বঙ্গাব্দে। সুতরাং বয়সে তিনি অধিকাংশ আধুনিক সাহিত্যিকেরই পিতা বা পিতামহের মত ছিলেন। কিন্তু কারুর কাছ থেকেই তিনি সে-রকম মর্যাদা, লাভ করতে চাইতেন না। বয়সে ছেলে বা নাতির মত ব'লে কেউ যে তাঁকে সমীহ ক'রে তফাতে তফাতে থাকে, এটা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। প্রায় সমবয়স্কের মত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করাই ছিল তাঁর স্বভাব। বয়সে যত ছোটই হোক্, সকলকেই আদর ক'রে পাশে টেনে নিতেন, 'ভাই' ব'লে ডাকতেন, মিষ্ট কথা বলতেন। এজন্যে তিনি হয়ে পড়েছিলেন 'সরকারি দাদা'। পিতারাও তাঁকে 'জলধরদাদা' ব'লে ডাকতেন এবং তাঁদের ছেলেদেরও কাছে তিনি ছিলেন 'জলধরদা'। বলা বাহুল্য তিনি ছিলেন আমারও 'দাদা'।

পত্নীবিয়োগের পর অনেকেরই মনে যৌবনেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। তার ফলে সাহিত্য লাভবান হয় মাঝে মাঝে। রবীন্দ্রনাথের

"স্মরণ" ও অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" প্রভৃতি কাব্যপুঁথি পত্নী-বিয়োগেরই ফল। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে পড়ছে। অক্ষয়কুমার যখন "এষা" রচনায় নিযুক্ত, তখন একদিন আমাকে বললেন, 'দেখ হেমেন্দ্র, কবি টেনিসনের মন যে মানুষের মত মরমী ছিল "ইন্ মেমোরিয়াম" (বন্ধুবিয়োগে রচিত) পাঠ করলে তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু রবিবাবুর মন বড় কঠিন, আত্মীয়বিয়োগেও তিনি ব্যথা পান না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কথা কেন বলছেন?'

—'স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি যে ব্যথা পেয়েছেন, তাঁর কাব্যের ভিতরে এমন প্রমাণ নেই।'

আমি "স্মরণ" কবিতাগুচ্ছের উল্লেখ করলুম।

তিনি বললেন, 'টেনিসনের "ইন্ মেমোরিয়ামে"র কাছে "স্মরণ" উল্লেখযোগ্যই নয়। একখানা চটি বই— অকিঞ্চিৎকর।'

আমি বললুম, 'হাটের মাঝে ভালো ক'রে শোক জাহির করবার জন্যে মস্ত মস্ত শোককাব্য রচনা করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। "স্মরণে"র মধ্যে সাতাশটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা আছে। "নৈবেদ্যে"র মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের ঐ শ্রেণীর আরো কবিতা আছে। তাই-ই যথেষ্ট নয় কি?'

অক্ষয়কুমার জবাব দিলেন না। মুখ দেখে বুঝলুম, অসন্তুষ্ট হলেন। পরেও তাঁর মুখে ঐরকম কথা শুনেছি।

যাক্, যা বলছিলুম। পত্নীবিয়োগের পর শোককাতর হয়ে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" রচনা ক'রে বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। জলধরবাবুর সব চেয়ে বিখ্যাত পুস্তক হচ্ছে "হিমালয়"। তাও মুখ্য ভাবে না হোক্, গৌণ ভাবেই পত্নীবিয়োগেরই ফল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মনে বৈরাগ্যের উদয়

হওয়াতে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে হিমালয়ের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সেই ভ্রমণকাহিনীই পরে "হিমালয়" ও "পথিক" প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হয়।

প্রথম শোকের ধাক্কা সামলে নিয়ে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আবার বিবাহ করেছিলেন এবং "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে"র মত আর কোন গদ্যকাব্য রচনা করেন নি। জলধরবাবুও দেশে ফিরে দ্বিতীয় বিবাহ ক'রে সংসারী হয়েছিলেন।

জলধরবাবুর দেশ হচ্ছে কুমারখালি। তিনি সাহিত্যচর্চাও করেছেন অল্পবয়স থেকেই। তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাতও পল্লীগ্রামেই। প্রথমে তিনি "গ্রামবার্তা"র সম্পাদক হন, তারপর সারাজীবনই সম্পাদকীয় কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে "বসুমতী", "হিতবাদী", "সুলভ সমাচার" ও "ভারতবর্ষ" পত্রিকা।

জলধরবাবুর লেখনী ছিল বড় মিষ্ট, বড় দরদী; তাই অতি অনায়াসেই পাঠকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারত। স্বচ্ছ, সরল, সরস ভাষা— যেন সোজা তাঁর প্রাণের ভিতর থেকেই বেরিয়ে এসে ঝ'রে পড়ত লেখনীমুখ দিয়ে, কোনরকম কৃত্রিমতার ধার না ধেরেই। বাংলা সাহিত্যে আগে সত্যিকার ভ্রমণকাহিনীর বড়ই অভাব ছিল। আগে যাঁরা ভ্রমণকাহিনী লিখতেন, তাঁরা ভ্রমণকাহিনী রচনার আর্ট জানতেন না (যেমন এখনো অনেকেই জানেন না)। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের "য়ুরোপযাত্রী" এবং অন্যান্য দু-একজনের রচনায় এর ব্যত্যয় দেখা গেছে বটে। কিন্তু জলধরবাবুর প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ দরদী ভাষায় হিমালয়ের ভ্রমণকাহিনীগুলি যখন মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে লাগল, পাঠকসমাজ তা গ্রহণ করলে সাগ্রহ আনন্দে। তার আগে আর

কোন ভ্রমণকাহিনী এত আদর পায় নি, এত লোকপ্রিয় হয় নি। সেই সময়েই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে লাভ করেন নিজের ন্যায্য আসন।

কিন্তু কেবল ভ্রমণকাহিনী নয়, ছোটগল্প রচনাতেও প্রকাশ পেত তাঁর যথেষ্ট মুনশীয়ানা। এক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষা পাঠকদের আকৃষ্ট করত তো বটেই, তার উপরে বোঝা যেত, ছোটগল্পের আর্টও তাঁর ভালোরকমই জানা আছে। তিনি উপন্যাসও রচনা করেছেন, সেগুলির বিষয়বস্তু হয়তো বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, তাদের মধ্যে হয়তো যথেষ্ট মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু ভাষার গুণে ও বর্ণনাভঙ্গির জন্যে সেগুলিও অর্জন করেছে অসাধারণ জনপ্রিয়তা। তাঁর কোন কোন উপন্যাসের চাহিদা শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসেরও চেয়ে কম হয় নি। যেমন "অভাগী"।

সাপ্তাহিক বসুমতীর কার্যালয় যখন গ্রে স্ট্রীটে এবং আমার একটি কি দুটি রচনা যখন সবে মাসিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে বোধ হয় প্রায় চার যুগ আগের কথা। কেউ আমাকে পরিচিত ক'রে দেয় নি, নিজেই গিয়ে পরিচিত হয়েছি। তাঁর ভ্রমণকাহিনীগুলি পাঠ ক'রেই তাঁকে আমার চোখে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। ঠিক তারই আগে তাঁর বিশেষ বন্ধু দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে গিয়ে কি ভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিলুম পূর্বে সূত্রপাতেই তা বলেছি। সুতরাং তাঁর কাছে গিয়ে কি-রকম অভ্যর্থনা লাভ করব, সে বিষয়ে মনে মনে ছিল যথেষ্ট সন্দেহও।

তখন তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদক। বসুমতী কার্যালয়ে প্রবেশ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে দেখলুম, সামনের ঘরেই টেবিলের ওপাশে ব'সে আছেন জলধরবাবু। দেখেই চিনলুম,

কারণ পত্রিকায় তাঁর ছবি দেখেছি। মাথায় মাঝারি, দোহারা চেহারা, কৃষ্ণবর্ণ। মুখে দাড়ী-গোঁফ এবং একটি চুরুট।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চান?'

—'আজ্ঞে, আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

—'কিছু দরকার আছে?'

—'আপনার সব লেখাই পড়েছি, কিন্তু আপনাকে চোখে দেখি নি। তাই এসেছি।'

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, 'বসুন।'

বসলুম। আরো দু-চারটে কথাবার্তা হ'ল, সব কথা এতদিন পরে মনে পড়ছে না। তবে এইটুকু বেশ মনে আছে, তাঁর বিনীত ও মিষ্ট ব্যবহারে পরম আপ্যায়িত হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছিলুম।

তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে অসংখ্য বার। যখন যেখানে বাসা বেঁধেছেন, সেখানেই গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি এবং প্রতি বারেই ফিরে এসেছি মনের ভিতর খানিকটা সুমধুর প্রীতির ভাব নিয়ে। তিনি পরনিন্দাও করতেন না, কারুকে ছোট করতেও চাইতেন না এবং তাঁর ভাবভঙ্গিভাষায় কোনদিনই আমি এতটুকু হমবড়া ভাব লক্ষ্য করি নি, বরং অন্য কোন লেখককে প্রশংসা করবার সুযোগ পেলে তিনি হ'তেন যারপরনাই আনন্দিত। একটা দৃষ্টান্ত দি।

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যখন স্বর্গত হন, আমি তখন অশ্রান্ত ভাবে কবিতা রচনা করছি। সেই সময়ে বৈদ্যবাটী যুবক-সমিতি আমাকে অভিনন্দন দেবার জন্যে এক সভার আয়োজন করেন, সভাপতি ছিলেন শিল্প তথা সাহিত্যের আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক সভায় যোগদান করেছিলেন। জলধরবাবু

বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ আজ পরলোকে। কিন্তু আমার মনে হয়, হেমেন্দ্রকুমারের কবিতার ভিতর দিয়ে আবার তিনি আত্মপ্রকাশ করছেন' প্রভৃতি। আমি তো লজ্জাসঙ্কোচে মাথা হেঁট করলুম। অবনীন্দ্রনাথ চুপিচুপি আমার কানে কানে বললেন, 'ও হেমেন্দ্র! জলধরবাবু বলেন কি হে? সত্যেন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা নাকি তোমার উপরে ভর করেছে? দেখো, খুব সাবধান!'

একদিন জলধরবাবুর বাড়ীতে ঢুকেই দেখি, বৈঠকখানায় তিনি ব'সে আছেন একলাটি। আমার হাতে সিগারেট ছিল, ফেলে দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলুম। সেটা তিনি লক্ষ্য করলেন। বললেন, 'ভায়া, আমার মত বার্মা চুরুট ধর না কেন?'

বললুম, 'দাদা, ওর কালো রং আর কড়া আকার দেখলে ভয় হয়। টান দিয়ে হয়তো সামলাতে পারব না।'

তিনি বললেন, 'না হে, না। তোমার ভয় অমূলক। বার্মা চুরুটের ধোঁয়া সিগারেটের চেয়ে মিষ্টি আর নরম। এই নাও, আমার সামনেই পরীক্ষা ক'রে দেখ।' ব'লেই আমার হাতে গুঁজে দিলেন একটা চুরুট।

বিলাতের চার্চিল সায়েব নাকি চুরুটের প্রেমে মশগুল; জলধরবাবুও ছিলেন তাই। সর্বদাই চুরুটের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হ'তেন দৃশ্যমান। আজও চুরুট দেখলে তাঁর কথাই আমার মনে পড়ে এবং তাঁর কথা ভাবলে মনে পড়ে চুরুটের কথা।

জলধরবাবুর এক ছেলের বিয়ে। আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন, কিন্তু আমি হই নি। নিমন্ত্রণের জন্যে কোনদিনই আমি লুব্ধ নই, বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা না ক'রে বারংবার তিরস্কৃত হয়েছি। কিন্তু সে দিন আমার মাথায় জাগল দুষ্টবুদ্ধি।

স্থির করলুম, অনাহূত হয়েই জলধরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে বেশ খানিকটা অপ্রতিভ ক'রে আসব। বলা বাহুল্য, মাটির মানুষ জলধরদা ছাড়া আর কোন দাদা বা কাকা বা জ্যাঠার বাড়ীতে আমি এমন রবাহূতের মত গমন করতে পারতুম না। যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে হাজির। জলধরবাবুর সঙ্গে দেখা। বললুম, 'দাদা, আপনি আমাকে ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাকে ভুলতে পারলুম না। লুচি-মণ্ডা খেতে এসেছি বিনা নিমন্ত্রণেই।'

জলধরবাবু একটুও অপ্রস্তুত হ'লেন না, হো-হো রবে উচ্চহাস্য ক'রে প্রায় আমাকে আলিঙ্গন করেন আর কি! তারপর ত্রুটি-স্বীকার ক'রে বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে ভায়া, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি এসেছ ব'লে বড় সুখী হয়েছি, বড় সুখী হয়েছি।'

এমনি আরো কত গল্প আছে। কিন্তু বেশী গল্প বলবার জায়গা কোথায়?

এমন মানুষের পিছনেও লোকে লাগতে ছাড়ে নি। যে-সে লোক নয়, তাঁর পরম বন্ধু এবং ছাত্র দীনেন্দ্রকুমার রায় পর্যন্ত। জীবনসন্ধ্যায় যখন মহাপ্রস্থানের সময় প্রায় আগত, ছাপার হরফে দীনেন্দ্রবাবু রটিয়ে দিলেন, জলধরবাবুর "হিমালয়ে"র লেখক হচ্ছেন তিনিই। কিন্তু এ যে কত-বড় মিথ্যাকথা, লোকের তা বুঝতে বিলম্ব হয় নি। "হিমালয়ে"র মধ্যেই আছে তার আভ্যন্তরিক প্রমাণ। জলধরবাবুব একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব 'ষ্টাইল' ছিল, দীনেন্দ্রকুমারের 'ষ্টাইলে'র সঙ্গে যার কিছুমাত্র মিল নেই। সাহিত্যিকদের 'ষ্টাইল' হচ্ছে তাঁদের স্বাক্ষরেরই সমান, বিশেষজ্ঞদের চক্ষে তা ধরা পড়বেই। আসলে বন্ধুর খ্যাতি, তাঁর প্রতিষ্ঠা, রাজদ্বারে তাঁর সম্মান দেখে প্রায়-নির্বাপিত দীনেন্দ্রবাবুর মনে জেগে উঠেছিল দারুণ ঈর্ষা।

জলধরবাবুকে আরো কেউ কেউ আঘাত করতে চেয়েছে—নিতান্ত গায়ে প'ড়েই। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন, কিন্তু 'দুরাত্মার ছলের অভাব নেই।' এঁদের লক্ষ্য ক'রে বিখ্যাত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি পত্রে লিখেছিলেন : 'জলধরবাবুর মত সজ্জনকে যারা অপদস্থ কতে চায়, তাদের ভগবান ক্ষমা করুন।'

বাইশ

সারাদিন একান্তভাবে সাহিত্যচর্চার পর সন্ধ্যার পর মন চাইত খানিকটা ছুটি পেতে। তাই এখানে-ওখানে যেখানেই গান-বাজনার আসর বসত, প্রায়ই সেখানে গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসতুম। মনের ছুটিকে সার্থক ক'রে তুলতে সঙ্গীতের মত আর জুড়ি নেই।

ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গেই বলেছি, আমার স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসুর দর্জিপাড়ার বাড়ীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যা-কালে বসত গান-বাজনার একটি চমৎকার বৈঠক। সেখানে কেবল করমতুল্লা খাঁয়ের সরোদের সঙ্গেই প্রথম পরিচিত হই নি, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গানও প্রথমে সেখানেই শুনেছিলুম। আর একজন গুণীও সেখানে আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন গয়ার বিখ্যাত ওস্তাদ হনুমানপ্রসাদের পুত্র সোনিজী। হারমোনিয়ম তো সবাই বাজায়, কিন্তু হারমোনিয়মের ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল যে আত্মগোপন ক'রে আছে, তা তেমন-ভাবে প্রকাশ করতে আর কারুকে দেখি নি। উচ্চতর ওস্তাদ-সমাজে হারমোনিয়ম কতকটা অবজ্ঞেয় হয়ে আছে। কিন্তু যথার্থ গুণীর হাতে পড়লে সেও করতে পারে অনুপম সৌন্দর্যসৃষ্টি। প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর আগে বিখ্যাত উকীল ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত ও কবি শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির সঙ্গে শান্তিপুরে গিয়ে হারমোনিয়মের আর এক বাঙালী শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম। তাঁর ডাকনাম ছিল বোধ করি বীণবাবু,

তিনি কলকাতার হ্যারিসন রোডের বিখ্যাত ওস্তাদ শ্যামলালবাবুর শিষ্য। তিনিই প্রথমে আমাকে বুঝিয়ে দেন, হারমোনিয়মও অসামান্য হয়ে উঠতে পারে। করমতুল্লা খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রফিক খাঁও আর একজন অসাধারণ হারমোনিয়ম-বাদক।

নরেন্দ্রনাথের বৈঠকেই সর্বপ্রথমে গায়ক জমীরুদ্দীন খাঁ ও তবলা-বাদক দর্শন সিংকে দেখি।

এই দর্শন সিংও ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। তবলায় তাঁর হাতের বোল সৃষ্টি করত অপূর্ব মাধুর্য। তিনি করমতুল্লা খাঁয়ের সরোদের সঙ্গে এবং জমীরুদ্দীন খাঁয়ের গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। কিন্তু তারের যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর তবলা বাজত যে সুরে ও যে চালে, কণ্ঠ-সঙ্গীতের সময়ে বদলে যেত তার সুর ও চাল।

জমীরুদ্দীনের রংটি কালো হ'লেও দেহখানি ছিল সুঠাম ও মুখখানিও সুদর্শন এবং সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁর ভাবমধুর চোখদুটি— রীতিমত প্রেমিকের চোখ। গানের সময়ে সেই চোখ দুটির ভিতর দিয়েও দেখা যেত বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি।

চমৎকার ঠুংরি গাইলেন তিনি, ভিজিয়ে দিলেন মন সুর-ধারাপাতে। অপূর্ব গানের গলা, গাম্ভীর্যে ভরপূর হ'তেও পারে, আবার পেলবতায় তরল হয়েও আসে। তান, মাড়, গিটকিরি কিছুরই অভাব নেই এবং সবই অভিব্যক্ত হয় উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর দরদের ভিতর দিয়ে। হলুম মুগ্ধ।

তারপর তাঁর ঘন ঘন দেখা পেতে লাগলুম আমার আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্ববিখ্যাত মল্লযোদ্ধা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবুর বৈঠকে। সেখানে যাঁরা আসনগ্রহণ করতেন তাঁদের অধিকাংশই সঙ্গীতবিদ, পালোয়ান বা অন্য শ্রেণীর লোক, সাহিত্যিকদের মধ্যে থাকতুম কেবল আমি ও প্রেমাঙ্কুর (আতর্থী)।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে চলত জমীরুদ্দীনের গান ও দর্শন সিংয়ের তবলা। রাতের পর রাত এই ব্যাপার। রাত যত গভীর হয়, গান তত জ'মে ওঠে। জমীরুদ্দীনের গানের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত, প্রতি রাত্রেই শুনি নূতন নূতন গান— খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, গজল, ভজন। তাঁর কণ্ঠও যেন শ্রান্ত হ'তে শেখে নি। তারপর মধ্যরাত্রে গানের পালা থামিয়ে করমতুল্লা খাঁ যেদিন আবার সরোদ ধারণ ক'রে বাজাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তেন, মনে মনে আমরা প্রমাদ গুণতুম। বেশ বুঝতুম, সেদিন বাড়ীতে ফিরতে ফিরতেই হয়তো ভোরের পাখীর নিদ্রাভঙ্গ হবে। কারণ খাঁ-সাহেব বীণা ধরবার পর কেউ আসর ত্যাগ করলে মনে মনে তিনি অত্যন্ত আহত হ'তেন। একদিন আমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে তিনি আমার হাত চেপে ধ'রে বন্দী করেছিলেন, সে গল্প তাঁর প্রসঙ্গে আগেই বলেছি।

দিনে দিনে জমীরুদ্দীনের সঙ্গে আমার আলাপ একটু একটু ক'রে জ'মে উঠতে লাগল। তিনি বাঙালী মুসলমান ছিলেন না, বাংলা বর্ণপরিচয়ও বোধ করি হয় নি, তবে বহুকাল এদেশে বাস ক'রে বাংলা বলতে শিখেছিলেন। উচ্চারণে কিছু কিছু ভুল হ'ত বটে, কিন্তু মনের ভাব ব্যক্ত করতে তাঁর অসুবিধা হ'ত না।

নরেনবাবুর বৈঠক আগেই উঠে গিয়েছিল, কিছুদিন পরে গোবরবাবুর আসরও ভেঙে গেল। এইরকমই তো হামেসা হয়। এক আসর উঠে যায়, আবার নূতন আসরের পত্তন হয়। কিন্তু ঐ দু'টি আসরের অভাব পূরণ করতে পারে, আজকাল এমন কোন আসরের নাম শুনতে পাই না।

কয়েক বৎসর কেটে যায়। জমীরুদ্দীনের দেখা বা সাড়া পাই না। এর-তার মুখে খবর পাই, অমুক অমুক ব্যক্তি জমীরুদ্দীনের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করছেন, তাঁদের কেউ কেউ আজ

সুবিখ্যাত হয়েছেন। একদিন শুনলুম নজরুল ইসলাম জমীরের কাছে গান শিখছেন। নজরুল যে গায়ক হবার জন্যে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি, এ কথা তখন তিনি বুঝতে পারেন নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

অনেক দিন পরে গ্রামোফোন কোম্পানীর কার্যালয়ে জমীরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা। তখন আমি গান রচনার দিকে ঝোঁক দিয়েছি খুব বেশী মাত্রায়। আমার কলমে এসেছিল গানের বন্যা, প্রত্যহই গান রচনা করি। গ্রামোফোনের রেকর্ডে প্রায়ই আমার গান প্রকাশিত হ'ত এবং জমীরুদ্দীন ছিলেন ওখানকার অন্যতম সঙ্গীত-শিক্ষক। আমাকে দেখেই ভারি খুসি। হাসিমুখে বললেন, 'দাদা, আপনার কথাই ভাবছিলুম।' আমি বললুম, 'সে কি হে, চোরে-কামারে দেখা নেই, আমার কথা ভাবছিলে মানে?' জমীর বললেন, 'উর্দু গানের সুরে আমাকে খানকয় বাংলা গান বেঁধে দিতে পারবেন?' আমি বললুম, 'তা পারব না কেন? কিন্তু উর্দু গানগুলি না শুনলে তো সেই চালে গান লিখতে পারব না।' তিনি বললেন, 'বেশ, কালকেই আপনাকে গান শুনিয়ে আসব।'

কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, 'নজরুল এখনো তোমার কাছে গান শেখে কি?'

প্রবল মস্তকান্দোলন ক'রে জমীর বললেন, 'না। নজরুলকে আমি আর কখনো গান শেখাব না।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'হয়েছে কি, এত চটেছ কেন?'

তিনি বললেন, 'দাদা, না চটে কি থাকা যায়? নজরুল আমার কাছ থেকে গানের পর গান শিখতে লাগল। তারপর সে কি করলে জানেন? বাংলা গানে সেই সব গানের সুর বসিয়ে এখানেই এসে শিখিয়ে যেতে লাগল। বলুন, এর পরেও কি তাকে আর

গান শেখানো চলে? শেষটা কি আমার অন্ন মারা যাবে?'

আমি হেসে বললুম, 'নজরুল খুব বেশী অন্যায় করেছে ব'লে মনে হয় না। সে তো গায়ক হবার জন্যে তোমার কাছে গান শিখতে চায় নি। সে চেয়েছিল কেবল নতুন নতুন সুর শিখতে, নিজের কাজে লাগাবে ব'লে। এটা তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

পরদিনই জমীর আমার বাড়ীতে এসে হাজির। আমাকে কয়েকটি উর্দু গান শোনালেন। গানের কথাগুলি কাগজে টুকে নিয়ে আমি বললুম, 'হপ্তাখানেক পরে এসে গান নিয়ে যেও।'

জমীর বললেন, 'আমি কেবল গান নিতে আসব না, সেদিন আপনাকে ভালো ক'রে গান শুনিয়েও যাব। শুনতে পাই, আপনার বাড়ীতে প্রায়ই গানের আসর বসে, নামজাদা গাইয়েরা আসেন, কিন্তু কোনদিনই তো আপনি এই গরীবকে স্মরণ করেন না।'

জমীরের কণ্ঠে অভিমানের সুর। বললুম, 'ভাই, বড় বড় গাইয়েদের অনেকেই আমার এখানে এসে গান গেয়ে যান বটে, তবে তাঁরা আসেন দয়া ক'রে, কেবল ভালোবাসার খাতিরে। কিন্তু তোমাকে ডাকি কেমন ক'রে, উচিতমত দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই!'

জমীর বললেন, 'কেন দাদা, আমিও কি আপনাকে ভালোবাসতে পারি না? আমি কি কেবল টাকার খাতিরেই গান গাই? মনের মত সমঝদার পেলে টাকার কথা আমার মনেও ওঠে না। এবার থেকে আমিও এখানে গান গাইতে আসব। কেবল আমাকে একটু রঙিন ক'রে দিলেই চলবে, রঙিন না হ'লে আমার গান খোলে না।'

তাঁর কথার অর্থ বুঝলুম। তিনি চান সুরাদেবীর প্রসাদ।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'বেশ, তাই হবে।'

তারপর থেকে আমার বাড়ীতে হ'তে লাগল জমীরুদ্দীনের ঘন ঘন আবির্ভাব। এক-একদিন কোন খবর না দিয়েই তিনি এসে পড়তেন এবং সেদিন নিজেই কোন ভালো তবলচীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতেন। আসর বসত সন্ধ্যার সময়ে এবং রাত দুটো কি তিনটের আগে সে আসর আর ভাঙত না। কোন কোন দিন অন্যান্য গায়করাও থাকতেন এবং শ্রোতার সংখ্যাও বড় কম হ'ত না। আবার এক-একদিন শ্রোতা হতুম আমি একলাই, কিন্তু তবু জমীরের উৎসাহের অভাব হ'ত না কিছুমাত্র। জ্যোৎস্নাপুলকিত গঙ্গার কলকল্লোলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি স্তব্ধ নিশীথের বুকের ভিতরে ঢেলে দিতেন গানের পর গানের ধারা। যত রাত বাড়ে, তত বাড়ে সুরার মাত্রা এবং তত বাড়ে তাঁর গাইবার উৎসাহ। কিন্তু এ উৎসাহ মদ্যপের উৎসাহ নয়, এ হচ্ছে শিল্পীর উৎসাহ। নিজেই তিনি ডুবে যেতেন যেন গীতরসধারার মধ্যে। প্রচুর মদ্য পান করেছেন, পা টলছে, তবু কোনদিন কিছু বেচাল দেখি নি, কোনদিন তাল কাটে নি, গলা বেসুরো বলে নি।

কিন্তু যে কোন শিল্পীর পক্ষেই মদ্য হচ্ছে দারুণ অভিশাপের মত। বিশেষতঃ কণ্ঠসঙ্গীত নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁদের তো মদ স্পর্শ করাই উচিত নয়। জমীরুদ্দীনের যথেষ্ট সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল বটে, কিন্তু সুরার বিষ নিশ্চয়ই তাঁর দেহের ভিতরটা জীর্ণ ক'রে দিচ্ছিল ধীরে ধীরে।

একদিন দুপুর বেলায় তিনতালার বারান্দার প্রান্তে ব'সে রচনা-কার্যে নিযুক্ত আছি, হঠাৎ একতালা থেকে জমীরের গলার সাড়া পেলুম, 'দাদা, দাদা!'

আমি তাঁকে উপরে আসতে বললুম। তিনি উপরে এলেন, কিন্তু কি মূর্তি! অস্নাত চেহারা, চক্ষু স্ফীত, প্রায় দাঁড়াতে পারেন না, এমন অবস্থা।

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'ব্যাপার কি জমীর?'

তিনি ধপাস্ ক'রে ব'সে পড়ে বললেন, 'কাল রাতে একটা বড় মাইফেল ছিল, আমার মাত্রা বড় বেশী হয়ে গেল। তারপর সকাল থেকে খাচ্ছি, এখন আপনার এখানে আবার খেতে এসেছি।'

আমি বললুম, 'মাপ কর ভাই জমীর, তা হয় না। দেখছ তো আমি লিখছি, তোমাকে নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত হ'তে পারব না।'

বাড়ীর সামনেকার গঙ্গার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে জমীর চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে চ'লে গেলেন।

ভেবেছিলুম জমীর রাগ ক'রে আর আমার বাড়ীতে আসবেন না। কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল। হপ্তা তুই পরে আবার তাঁর আবির্ভাব। ওষ্ঠাধরে মিষ্ট হাসি, তুই চোখে প্রীতির ভাব।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখার কথা বলি। সেদিন "অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও"য় একটি গল্প পাঠ ক'রে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। সন্ধ্যাকাল। হঠাৎ পিছন থেকে কে আমাকে তুই হাতে সজোরে জড়িয়ে ধরলে— আমি চমকে দেখতে পেলুম কেবল একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী। এই অভাবিত ও আকস্মিক আলিঙ্গন থেকে কোন রকমে নিজকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ফিরে দেখি, জমীরুদ্দীন!

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'কি দাদা, ভয় পেলেন নাকি?'

বললুম, 'তা একটু পেয়েছিলুম বৈকি! ভেবেছিলুম গুণ্ডার হাতে পড়েছি!'

জমীর বললেন, 'অনেক দিন দেখি নি কিনা, তাই একটু আদর করতে সাধ হ'ল।'

তার অল্পদিন পরেই খবর পেলুম, জমীর আর ইহলোকে নেই। এমন একজন উদারপ্রাণ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ যে অতিরিক্ত মদ্যপান, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

জমীর প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'দাদা, আমার ছেলেও খুব ভালো গাইতে শিখেছে, বেটা বাপের নাম রাখবে। আপনাকে তার গান একদিন শুনিয়ে দেব।'

জমীরের জীবদ্দশায় তাঁর পুত্রের গান আর শোনা হয় নি। কিন্তু বছর তিন আগে একটি আসরে তার গান শুনেছিলুম। অনেকটা বাপের মতই চেহারা, গলা ও গাইবার ঢং। অল্পদিনেই সে বেশ নাম কিনেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তরুণ বয়সেই সে পিতার সঙ্গীতপ্রতিভার সঙ্গে পিতার দুর্বলতারও উত্তরাধিকারী হয়েছিল। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সেও আজ পরলোকে।

তেইশ

উনত্রিশ বছর আগেকার কথা। সাধারণ রঙ্গালয়ে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাতুড়ী সবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর অপূর্ব নাট্য-প্রতিভা দেখে বিশেষজ্ঞদের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, গিরিশোত্তর যুগের জরাজীর্ণ অভিনয়মঞ্চ ভূমিসাৎ হবার সময় এসেছে।

ষ্টার থিয়েটার চালাচ্ছেন তখন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে অভিনয় হচ্ছে, ভিতরে ব'সে আমি অপরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করছি। এমন সময়ে ফিটফাট বিলাতী পোষাক প'রে একটি যুবকের আগমন। তাঁর মার্জিত মুখশ্রী ও সুগঠিত দেহ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাবভঙ্গির মধ্যেও আভিজাত্যের লক্ষণ।

জিজ্ঞাসু চোখে অপরেশচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, 'উনি হচ্ছেন মিঃ মুখার্জি— রাধিকানন্দ মুখার্জি। উঁচুদরের সৌখীন অভিনেতা।'

তখনকার সৌখীন অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলুম না। রাধিকানন্দ কোন্ শ্রেণীর অভিনেতা আমি তা জানতুম না, কোনদিন তাঁর নাম পর্যন্ত শুনি নি। সেইদিনই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল এবং তাঁর নিজের মুখেই শুনলুম, তিনি সিমলার পাহাড়ে থাকেন। সরকারি আপিসে কাজ করেন। দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন।

বললুম, 'শিশিরবাবু তো দু'দিনেই আসর খুব জমিয়ে তুলেছেন। আপনারও অভিনয় করবার ইচ্ছা আছে নাকি?'

তিনি বললেন, 'ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু সুযোগ কই ?'

এরই দিন কয় পরে মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। উপেন্দ্রবাবু বললেন, 'শিশিরবাবু এসে আমাদের বাজার মাটি ক'রে দিয়েছেন। সেইজন্যে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।'

সতীশবাবু বললেন, 'আমরা বেশ বুঝতে পারছি, কেবল পুরানো দলের লোক নিয়ে থিয়েটার আর চলবে না। আমরাও শিশিরবাবুর মত কোন শিক্ষিত নূতন অভিনেতা চাই। বাজারে নরেশচন্দ্র মিত্রের খুব নাম-ডাক শুনতে পাই। তিনি যদি আমাদের থিয়েটারে যোগ দেন, তাহ'লে আমরাও শিশিরবাবুর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। এ বিষয়ে আপনি কিছু সাহায্য করবেন ?'

আমি বললুম, 'চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

তখনও নরেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয় নি। কিন্তু ইতিমধ্যে রাধিকানন্দের সঙ্গে আরো দুই-তিনবার দেখা হয়েছে এবং তাঁরই মুখে শুনেছি তিনি শিশিরকুমার ও নরেশচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবেই চেনেন। মিনার্ভা থিয়েটারের প্রস্তাব নিয়ে আমি তাঁরই কাছে গেলুম এবং সব শুনে তিনি বললেন, 'আমি নরেশকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সেইসঙ্গে আমিও ওখানে নামতে চাই।'

কিন্তু মিনার্ভার কর্তৃপক্ষের কাছে রাধিকানন্দ ছিলেন তখন Dark horse-এর মত। প্রথমটা তাঁরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তারপর আমি যখন বললুম, 'শিশিরবাবুর মুখে শুনেছি, রাধিকানন্দ একজন ভালো অভিনেতা', তখন তাঁরা আর অমত করলেন না।

মিনার্ভায় এলেন নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দ। তাঁদের মঞ্চস্থ

করবার জন্যে "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করা হ'ল। চাণক্য ও আন্টিগোনাসের ভূমিকায় যথাক্রমে নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দ।

আন্টিগোনাসের ভূমিকাটি রাধিকানন্দ যে নিজের জন্যে কেন বেছে নিয়েছিলেন, প্রথমটা আমি তা আন্দাজ করতে পারি নি। ওটি হচ্ছে "চন্দ্রগুপ্তে"র একটি অবান্তর ভূমিকা, তখন পর্যন্ত তা বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। রাধিকানন্দ মহলাও দিতে লাগলেন নিতান্ত সাধারণ ভাবেই, তাঁর অভিনয়ে যে অসাধারণ কিছু পাব তাও আমি বুঝতে পারলুম না।

কিন্তু তিনি মন্মথনাথ পালের (হাঁদুবাবু) চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'রাধিকাবাবু মহলার সময়ে নিজের কলকৌশল প্রকাশ করতে রাজি নন। কিন্তু দেখবেন, ওঁর অভিনয় খুব উৎরে যাবে।'

সফল হ'ল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। প্রথম পুনরভিনয়ের রাত্রে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে দর্শকরা ঘন ঘন করতালি দিয়ে পরম সমাদরে অভিনন্দিত করলে রাধিকানন্দের অভিনয়কে এবং তারপর থেকে আন্টিগোনাসের সেই অবান্তর ভূমিকাটিই নাটকের মধ্যে হয়ে উঠল প্রধান ভূমিকার মত। কেবল আমিই অবাক হলুম না, মিনার্ভার কর্তৃপক্ষও রীতিমত বিস্মিত। তাঁর সংলাপ, দৈহিক ভঙ্গিমা, মৌখিক ভাবের ব্যঞ্জনা এবং প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সমস্তই হ'ল এমন অভিনব যে দর্শকরা উপলব্ধি করলে অভাবিত আনন্দ। নাট্যগগনে যে একটি নূতন তারকার সন্ধান পাওয়া গেল, সে সম্বন্ধে আর কারুর কোন সন্দেহ রইল না।

একক শিশিরকুমার পুরাতনকে ম্লান ক'রে দিয়েছিলেন বটে, তবে পুরাতনের প্রভাব থেকে আমাদের নাট্যজগৎ তখনো মুক্ত হ'তে

পারে নি। কিন্তু শিশিরকুমারের অব্যবহিত পরেই এলেন রাধিকানন্দ ও নরেশচন্দ্র এবং তারপরেই নির্মলেন্দু লাহিড়ী! এঁরা প্রত্যেকেই যখন জনসাধারণের প্রশস্তি লাভ করলেন, তখন ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষও আর উদাসীন হয়ে থাকতে পারলেন না, তাঁরাও সাদরে আহ্বান করলেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। এবং তার-পরেই শিশিরকুমার আবার আর একদল নূতন শক্তিশালী অভিনেতা (বিশ্বনাথ ভাতুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, ললিত লাহিড়ী, শৈলেন চৌধুরী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীরবি রায় ও শ্রীজীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি) নিয়ে আর একটি সম্প্রদায় গঠন করলেন, তখন পুরাতনের কোন গর্বই আর অবশিষ্ট রইল না, তার প্রধান দুর্গ মনোমোহন থিয়েটারের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেল।

আন্টিগোনাসের পর নাদির সাহ, প্যালারাম ও কেলো প্রভৃতি ভূমিকায় দেখা দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই রাধিকানন্দ একজন চৌকস অভিনেতা ব'লে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। ভবিষ্যতের জন্যে তাঁর আসন হয়ে গেল নির্দিষ্ট। তিনি ছিলেন একজন পদস্থ সরকারি কর্মচারী, ছয় মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। ক্রমে ছুটি এল ফুরিয়ে, কিন্তু তবু তাঁর ব্যস্ততা নেই। পাদপ্রদীপের মোহ তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে, তিনি স্থির ক'রে ফেললেন, আপিসের চাকরি আর করবেন না। চাকরি ছাড়তে আমি তাঁকে মানা করেছিলুম, কিন্তু তিনি শোনেন নি। ফল ভালো হয় নি। যশস্বী হলেন যথেষ্ট বটে, কিন্তু অর্থাভাবে মাঝে মাঝে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন— বিশেষতঃ শেষ-জীবনে। আর্ট পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে অর্থকর হয়, কিন্তু বাংলাদেশে

এসে অধিকাংশ শিল্পীকেই সে যশ দিতে পারলেও টাকা দিতে পারে না।

রাধিকানন্দ নানা রঙ্গালয়ে যত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, এখানে তার সুদীর্ঘ তালিকা আর দাখিল করলুম না। কিন্তু কি গম্ভীর, কি বীর এবং কি হাস্যরসের অভিনয়ে তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। "খাসদখলে"র নিতাইয়ের ভূমিকায় এবং "বলিদানে"র দুলালচাঁদের ভূমিকায় যথাক্রমে অমৃতলাল বসু ও দানীবাবু ছিলেন অতুলনীয়। কিন্তু ঐ দুটি ভূমিকাও গ্রহণ ক'রে তিনি বড় অল্প শক্তির পরিচয় দেন নি। গোড়ার দিকে তাঁর অভিনয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় 'মেলো-ড্রামাটিক' হয়ে উঠত বটে, কিন্তু ক্রমেই এই বাহুল্য থিতিয়ে যায় এবং তাঁর অভিনয় হয়ে ওঠে রীতিমত সংযত ও পরম স্বাভাবিক।

আর এক শ্রেণীর ভূমিকাভিনয়ে নূতন দলের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না আর কেউ। যখনই তিনি সাহেবের বা ইঙ্গবঙ্গের ভূমিকায় নেমেছেন, তখনই আসর একেবারে মাৎ ক'রে দিয়েছেন। সিমলার পাহাড়ে তিনি প্রায় য়ুরোপীয়দের মতই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন এবং দীর্ঘকাল ধ'রে সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছেন। হাউইট-ফিলিপদের বিলাতী নাট্য-সম্প্রদায় কিছুকাল সিমলার পাহাড়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে তিনিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সুতরাং এ শ্রেণীর ভূমিকায় অভিনয় করবার মত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যে তাঁর যথেষ্ট ছিল, এটুকু সহজেই বোঝা যায়। এই অভিজ্ঞতার অভাবেই আমাদের রঙ্গালয়ের সাহেবের ভূমিকাগুলি প্রায়ই দস্তুরমত হাস্যকর হয়ে ওঠে, সেগুলিকে সাহেবের সঙ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। "রাজা বাহাদুর" প্রহসনে মাতাল

ইংরেজের ভূমিকায় রাধিকানন্দের যে চমৎকার অভিনয় দেখেছিলুম, তার ছবি এখনো আমার মন থেকে মুছে যায় নি। অমৃতলাল বসুও ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, কিন্তু তিনিও রাধিকানন্দের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি।

সাধারণ আবৃত্তির শক্তিও তাঁর অল্প ছিল না। বাংলায় রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" ও ইংরেজীতে টেনিসনের "দি চার্জ অফ দি লাইট ব্রিগেডে"র আবৃত্তি তাঁর মুখে শ্রবণ ক'রে মুগ্ধ হন নি এমন লোক নেই। এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" খুলে অর্জুনের ভূমিকার অপূর্ব অভিনয় ক'রে তিনি প্রমাণিত করছিলেন যে, গদ্যের মত পদ্যেও কাব্যমাধুর্য যথাযথভাবে অভিব্যক্ত করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর কত বেশী। সেই নাট্যাভিনয়ে তিনি উচ্চশ্রেণীর প্রয়োগনৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়েছিলেন।

কিন্তু নির্মলেন্দুর মত রাধিকানন্দও বৈতনিক অভিনেতার কাজে নিযুক্ত থেকে নিজের পরিপূর্ণ শক্তির সদ্ব্যবহার ক'রে যেতে পারেন নি। একটি নিজস্ব সম্প্রদায় গঠন ক'রে নাট্যাচার্যের কর্তব্য পালন করবার মত প্রতিভাও তাঁর ছিল। তবে সে শক্তির অল্প-বিস্তর পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তিনি শ্রীযুক্ত জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "নিবেদিতা" নাটকখানি খুলে। গান রচনার, সুর সংযোজনার ও নৃত্য-পরিকল্পনার ভার আমার উপরে দিয়ে তিনি আর সব ভারই নিজের হাতে তুলে নিলেন। সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নট-নটীই একেবারে কচি ও কাঁচা। তারা যে কতটা মুখ রক্ষা করতে পারবে, সে সম্বন্ধে আমার অল্প সন্দেহ ছিল না। কিন্তু রাধিকানন্দ সকলকে এমন অভাবিত ভাবে গ'ড়ে-পিটে 'মানুষ' ক'রে তুলতে লাগলেন যে, তাঁর নাট্যশিক্ষা দেবার ক্ষমতা দেখে আমি বিস্মিত

না হয়ে পারলুম না। যথাসময়ে "নিবেদিতা" মঞ্চস্থ হ'ল এবং প্রত্যেক নট-নটীই আপন আপন ভূমিকার মর্যাদা রক্ষা করলেন। অভিনয়ের এবং প্রয়োগনৈপুণ্যের দিক দিয়ে নাট্যরসিকদের কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিল ঐ নাট্যাভিনয়। এর পরেও একাধিক রঙ্গালয়ে আমি রাধিকানন্দকে অভিনয় শিক্ষা দিতে দেখেছি। নবযুগে অভিনয়শিক্ষকরূপে আমি শিশিরকুমারের পরেই তাঁর স্থান নির্দেশ করতে পারি। এ বড় অল্প সুখ্যাতির কথা নয়।

রাধিকানন্দ ছিলেন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রায়ই এসে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। একদিন বাড়ীর একতলা থেকে শোনা গেল রাধিকানন্দের কণ্ঠস্বর। নীচে নেমে দেখি, তিনি আমার মধ্যমকন্যা শেফালিকার কাঁধে মাথা রেখে ক্রন্দন করছেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি রাধিকা?'

তিনি সাশ্রুনেত্রে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'ভাই হেমেন্দ্র, আমি আর বাঁচব না। আমার মুখে ক্যান্সার হয়েছে।'

কিছুদিন পরেই পেলুম রাধিকানন্দের মৃত্যুসংবাদ। নাট্যজগতে আর কেউ এখনো তাঁর অভাব পূরণ করতে পারেন নি।

চব্বিশ

বোধ করি ১৩১৯ সালের কথা। নব পর্যায়ে "জাহ্নবী" পুনঃ-প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার কার্যালয়ে প্রত্যহই বসে আমাদের একটি সাহিত্য-বৈঠক। সেখানে যাঁরা ওঠা বসা করতেন তাঁদের অনেকেই আজ সুপরিচিত ব্যক্তি। যেমন শ্রীঅমল হোম (সরকারের প্রধান প্রচার-সচিব), শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী (সাহিত্যিক ও চিত্র-পরিচালক), শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় (অধুনালুপ্ত দৈনিক "ভারত" সম্পাদক), শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার (পুস্তক-প্রকাশক ও "মৌচাক" সম্পাদক) এবং শ্রীচারুচন্দ্র রায় (চিত্রশিল্পী ও চিত্র-পরিচালক) প্রভৃতি।

"যমুনা" নামে একখানি প্রায় নগণ্য ছোট মাসিক কাগজ প্রকাশিত হ'ত। তার সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল, তখন লেখকরূপে তাঁর কোন খ্যাতিই ছিল না। প্রভাত এসে একদিন বললেন, '"যমুনা"য় 'রামের সুমতি' নামে একটি আশ্চর্য গল্প বেরিয়েছে, তেমন গল্প আমি আর কখনো পড়ি নি।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'লেখক কে?' ভাবলুম, নিশ্চয়ই কোন বিখ্যাত লেখকের নাম শুনব।

কিন্তু প্রভাত বললেন, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

একেবারে অপরিচিত নাম। গল্পটি সম্বন্ধে প্রভাতের মতামত আমলে আনলুম না, কারণ তা অত্যুক্তি ব'লেই মনে হ'ল। তবু গল্পটি নিয়ে পড়তে বসলুম এবং পড়তে পড়তে অভাবিত বিস্ময়ে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বাংলা ভাষায় সত্য সত্যই সে শ্রেণীর

গল্প আর কখনো প্রকাশিত হয় নি। একেবারে প্রথম শ্রেণীর অসাধারণ লেখনীর দান। মনে মনে মানলুম, প্রভাত একটি অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন বটে।

কিন্তু কে এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? এটি কি কোন বিখ্যাত লেখকের ছদ্মনাম? নূতন কোন লেখকেরই হাত একেবারে এত বেশী পাকা হ'তেই পারে না। অমন যে প্রতিভার অবতার রবীন্দ্রনাথ, তাঁরও প্রথম দিককার রচনায় বয়সোচিত দুর্বলতার অভাব নেই। হাঁসের বাচ্চারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতার কেটে জলে ভাসতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্যিকরা লেখনীধারণের সঙ্গে সঙ্গেই পাকা লেখা লিখতে পারেন না। কত চেষ্টা ও পরিশ্রমের এবং দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার পর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পরিপূর্ণতা লাভ করেন, বিশেষজ্ঞদের কাছে তা অজানা নেই।

খোঁজ নিতে লাগলুম এবং দুদিন পরেই জানতে পারলুম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোটেই নতুন লেখক নন, যৌবন বয়স থেকেই তিনি আড়ালে ব'সে নিয়মিত ভাবে সাহিত্য-সাধনা ক'রে আসছেন, এমন কি ১৩১৪ সালে তাঁর রচিত "বড়দিদি" উপন্যাস "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল— যদিও সে সময়ে লেখকের নাম প্রকাশ করা হয় নি।

তারপর "যমুনা"য় বেরুতে লাগল শরৎচন্দ্রের "পথনির্দেশ", "বিন্দুর ছেলে" ও অন্যান্য রচনা। সে সময়ের কথা আমার বেশ মনে আছে। শরৎচন্দ্রের এক একটি নূতন রচনা প্রকাশিত হয়, আর সাহিত্য-সমাজে জাগে নব নব উত্তেজনা! এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে "যমুনা" পত্রিকারও নাম ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে। তার গ্রাহক-সংখ্যাও বেড়ে উঠতে লাগল হু-হু ক'রে।

ইতিমধ্যে "যমুনা"র সম্পাদক ফণীবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব

প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। বেশ মিষ্ট মানুষ ছিলেন তিনি। লেখক হিসাবে অসামান্য না হ'লেও, অন্য এক কারণে তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতার উপরে দাবি করতে পারেন। শরৎচন্দ্রকে প্রকাশ্যভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিলেন সর্বপ্রথমে তিনিই এবং এই কার্যে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আরো তিনজন বিখ্যাত লেখক— শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমার জীবনেও ঘটল এক ঘটনা। সরকারি চাকরি করতুম, আপিসের নাম "মিলিটারি অ্যাকাউন্ট্স্"। চাকরি কোনদিনই আমার ধাতে সইত না, এর আগেও গুরুজনদের তাড়নায় আরো ছুই জায়গায় চাকরি নিয়েছি, আবার ছেড়ে দিয়েছি। আপিসে গেলেই আমার মনে হ'ত, জলের মাছ যেন ডাঙায় এসে পড়েছি। তার উপরে ফণীবাবু প্রায়ই আপিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বলতে লাগলেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, আপনি চাকরি ছাড়ুন, "যমুনা"র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করুণ। আমি তাহ'লে ব্যবসার দিকটা দেখতে পারি।' অবশেষে তাই করলুম। চাকরি ছাড়লুম। সেই আমার শেষ চাকরি।

"যমুনা" কার্যালয়ে এসে আসন পাতলুম। কাগজের উপরে সম্পাদকরূপে ফণীবাবুর নামই রইল বটে, কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কীয় সমস্ত কর্তব্যই আমাকে পালন করতে হ'ত। তার উপরে ফণীবাবুর পীড়াপীড়িতে নূতন ক'রে আবার গল্প-রচনা সুরু করি এবং সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয়।

কিন্তু প্রথম পরিচয় হয় পত্রের দ্বারা, কারণ শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে থাকতেন। "যমুনা"য় আমার "কেরাণী" নামে একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয় এবং সেটি পাঠ ক'রে তিনি আমাকে

একখানি উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখলেন। তারপর থেকে আমাদের দুজনের ভিতরে নিয়মিত ভাবে পত্রালাপ চলতে থাকে।

একদিনের বৈকাল বেলা। "যমুনা"কার্যালয়ে টেবিলের ধারে ব'সে আমি রচনা নির্বাচন করছি, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে একটি লোকের আবির্ভাব। নিতান্ত সাধারণ চেহারা। নাতিদীর্ঘ কৃশ দেহ, কালো রং, মাথার চুল এলোমেলো, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, আধময়লা জামা-কাপড়, পায়ে চটি, সঙ্গে একটা লেড়ী কুকুরের বাচ্চা।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কাকে চাই ?'

—'ফণীবাবুকে।'

—'তিনি এখনো আসেন নি।'

—'তাহ'লে আমি একটু বসব কি ?'

বিনাবাক্যব্যয়ে দূরের একখানা বেঞ্চির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলুম। তারপর আর সেদিকে না তাকিয়ে নিজের মনেই আমি কাজ করতে লাগলুম।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। লোকটির সঙ্গে কুকুরের বাচ্চাটা খেলা করতে লাগল। তারপর ফণীবাবুর প্রবেশ।

ঘরে ঢুকেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, 'একি, শরৎবাবু যে! ওখানে বেঞ্চের উপরে ব'সে আছেন কেন ?'

তিনি আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, 'উনি যে আমাকে এখানেই বসতে হুকুম দিলেন।'

ফণীবাবু বললেন, 'না, না, চেয়ারে এসে বসুন। সে কি হেমেন্দ্রবাবু, আপনি শরৎবাবুকে চিনতে পারেন নি ?'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, 'কেমন ক'রে চিনব? আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী।'

শরৎবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

"যমুনা" কার্যালয়ে আমরা একটি বৃহৎ সাহিত্যবৈঠক রচনা করেছিলুম, তেমন বৈঠক আজ সহরের কোথাও নেই। সেখানে প্রত্যহ বৈকালের পরে যত বিখ্যাত সাহিত্যিক এসে আলাপ-আলোচনা করতেন, রীতিমত দীর্ঘ হবে তাঁদের নামের তালিকা। শরৎচন্দ্র রোজই এসে আসর জমিয়ে তুলতেন। তিনি কোনরকম কৃত্রিম ভঙ্গি বা গাম্ভীর্যের ধার ধারতেন না, গল্পের পর গল্প বলবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকতেন, আর কত রকমের গল্পই যে তিনি জানতেন! গল্প বলতে বলতে মাঝে মাঝে খেলার মার্বেলের মত বড় বড় আফিমের গুলি নিক্ষেপ করতেন বদনবিবরে। সভয়ে ও সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'হেমেন্দ্র, যদি আরো ভালো লিখতে চাও, আমার মত আফিম ধরো।'

আমি বললুম, 'মাপ করুন মশাই, ও-রকম একটি মাত্র ডেলা যদি খাই, তাহ'লে আর ভালো লেখার সময় পাব না, কারণ যমদূতেরা খবর পেয়ে ছুটে আসবে।'

শরৎচন্দ্র ছিলেন পয়লা নম্বরের আড্ডাধারী মানুষ, কোন কোন দিন দশ-বারো ঘণ্টা ধ'রে অশ্রান্ত ভাবে গল্প ক'রে গিয়েছেন, বাড়ী ফিরেছি আমরা রাত ছুটো কি তিনটের সময়ে। তাঁর সেই প্রথম আত্মপ্রকাশের যুগে যাঁরা তাঁকে দেখেন নি, তাঁরা আগেকার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারবেন না।

প্রতিদিনই আসর ভাঙবার পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাড়ী ফিরতুম আমি। তখন তিনি বাস করতেন বড়বাজারের এক কুবিখ্যাত পল্লীতে। সেই সময়ে পথ চলতে চলতে তিনি নিজের বিচিত্র জীবনের কথা আমার কাছে ব'লে যেতেন একান্ত অসঙ্কোচে। তাঁর

সরলতা দেখে বিস্মিত হতুম। একদিন বললেন, 'হেমেন্দ্র, এমন নেশা নেই যা করি নি, এমন কুস্থান নেই যেখানে যাই নি। আজ এই ভেবে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, এত ক'রেও তো আমি নিজকে হারিয়ে ফেলি নি! আমার মনের ভিতরকার মানুষটি চিরদিনই নির্মুক্ত হয়ে আছে।'

এক রাত্রের ঘটনা। বর্ষাকাল, বৃষ্টি নেমেছে বৈকাল থেকেই। কলকাতার পথে পথে নদীর মত জলোচ্ছ্বাস। আড্ডা সেদিন জমল না। রাত নয়টা বাজতে না বাজতেই রাস্তা জনবিরল হয়ে পড়ল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমি হাঁটুভোর জল ভাঙতে ভাঙতে বাড়ীমুখো হলুম। আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল একটি স্ত্রীলোক— কে সে, তার দিকে আমরা ভালো ক'রে তাকিয়েও দেখি নি। সেও আস্তে আস্তে চলছে, আমরাও আস্তে আস্তে চলছি, কারণ অত জলে জোরে চলবার উপায়ও নেই।

কিন্তু সেই দুর্যোগের রাত্রে প্রায়জনহীন পথেও যে আমাদের উপরে দৃষ্টিচালনা করবার জন্যে কৌতূহলী লোকের অভাব হয় নি, পরের দিন বৈকালে "যমুনা" কার্যালয়ে পদার্পণ ক'রেই সেটা বুঝতে পারলুম।

ইতিমধ্যে কোন্ মহাপুরুষ চারিদিকে রটনা ক'রে দিয়েছেন, আমরা দুজনে নাকি গতকল্য রাত্রে এক গণিকার পিছু নিয়েছিলুম।

আমি তো ব্যাপারটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলুম, কিন্তু শরৎচন্দ্র তা পারলেন না। বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন, 'ছি ছি, যা নয় তাই! এমন হতভাগা লোকও থাকে! আমি বুড়োমানুষ, আর হেমেন্দ্র হচ্ছে একরত্তি ছোকরা, আমাদের দুজনের নাম জড়িয়ে এমন অপবাদ!' তাঁর চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল, রটনাকারী সেখানে উপস্থিত থাকলে তার অঙ্গহানির সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট।

শরৎচন্দ্র বয়সে আমার চেয়ে বছর এগারো বড় ছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল বোধ হয় তেত্রিশ বৎসরের বেশী নয়। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি নিজেকে 'বুড়োমানুষ' ব'লে প্রচার করতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথের সামনেই তিনি বৃদ্ধত্বের উপরে এমনি অশোভন দাবি করতে কুণ্ঠিত হন নি, ফলে কবির চোখে ফুটে উঠেছিল কৌতুকযুক্ত বিস্ময়!

... ...

শিল্পী-মন নানাদিক দিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে— কখনো কাব্য বা সাহিত্য, কখনো সঙ্গীত, কখনো চিত্র এবং কখনো বা অন্যান্য চারুকলার ভিতর দিয়ে। এর সেরা নজীর হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রধানত কবি রূপেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত বটে, কিন্তু ললিতকলার কত দিকে ছড়িয়ে থাকত তাঁর রসগ্রাহী মন! কখনো তিনি গীতিকার, কখনো তিনি সুরকার, কখনো তিনি নট এবং কখনো বা চিত্রকর।

কিন্তু এ দেখে অবাক হবার কারণ নেই। সব আর্টেরই গোড়ার কথা এক। তাই এক শ্রেণীর শিল্পী চেষ্টা করলেই অন্য শ্রেণীর শিল্পীর গুপ্তকথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যিনি তা পারেন না, তাঁর শিল্পবোধ অল্প। আর্টের কোন বিভাগেই তিনি উচ্চ-শ্রেণীতে উন্নীত হবার যোগ্য নন।

শরৎচন্দ্রকে সবাই জানে ঔপন্যাসিকরূপে। কিন্তু তাঁর আরো কিছু কিছু পরিচয় আছে, জনসাধারণের কাছে যা অজ্ঞাত। কেবল লেখনী নয়, তুলিকা চালনাতেও তাঁর হাত ছিল না অপটু। আত্মজীবনীর এক জায়গায় নিজেই বলেছেন, সুদীর্ঘ আঠারো বৎসরকাল তিনি লেখনী ত্যাগ ক'রে বসেছিলেন। 'সাহিত্যের সঙ্গে হ'লো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনোদিন লিখেছি।'

কিন্তু তাঁর মত অসামান্য শিল্পীর চিত্ত আর্টকে একেবারে ভুলে রিক্ত হয়ে থাকতে পারে না। কলম ছাড়লেন বটে, কিন্তু তুলিকা

ধরলেন। তাঁর আঁকা ছবি যাঁরা দেখেছেন, প্রশংসা করেছেন। সে সব ছবি আমি দেখি নি, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বাড়ীতে আগুন লেগে ছবিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ফিরে-ফিরতি কলম ধরবার পর ছবি আঁকা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তিনি সঙ্গীত চর্চাও করেছিলেন অল্পবিস্তর। বাঁশী বাজাতে পারতেন, আর পারতেন তবলা বাজাতে। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মুখে জানতে পারি, যৌবনেই শরৎচন্দ্র গায়ক রূপেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রেঙ্গুনে অজ্ঞাতবাস করবার সময়েও গানকে তিনি ত্যাগ করেন নি। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন একবার রেঙ্গুনে বেড়াতে যান। তাঁর সম্বর্ধনা-সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত গেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে খুসি হয়ে কবি তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন "রেঙ্গুন-রত্ন"।

সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন পাথুরিয়াঘাটায় আমাদের পুরাতন বাড়ীতে। মা এসে বললেন, 'তোর পড়বার ঘরে কে একটি ভদ্রলোক চমৎকার গান গাইছেন।' বিস্মিত হয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখি, গালিচার উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ব'সে আপন মনে গান গাইছেন শরৎচন্দ্রই। কণ্ঠস্বরে ওস্তাদির ছাপ না থাকলেও বড় মিষ্ট গলা। গাইতেও পারেন ভালো। কিন্তু আমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গান থেমে গেল। বহু অনুরোধেও আর তিনি গাইলেন না। এর পরেও প্রায় তিনি আমার ঘরে এসে বসতেন, সেখানে তাঁর জন্যে দ্বার থাকত অবারিত এবং মাঝে মাঝে আড়াল থেকে তাঁর গান শুনেছি আরো কয়েকবার। কিন্তু আমার সাড়া বা দেখা পেলেই তাঁর গান হ'ত বন্ধ।

মসিজীবী শরৎচন্দ্রের মনের ভিতরে ছিল খানিকটা ক্ষাত্র

বিশেষত্ব। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়েই এটা টের পেতে বিলম্ব হয় নি। একদিন আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সর্বদাই সশস্ত্র হয়ে থাকেন এবং প্রমাণ দেবার জন্যে ফস্ ক'রে বার ক'রে ফেললেন মস্ত একখানা ছোরা! সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর পাশ থেকে স'রে গিয়ে বসলেন ভয়ে ভয়ে, সচকিত চক্ষে।

তারও কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি রীতিমত যশস্বী এবং যখন তিনি বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতিদিন উঠছেন বসছেন এবং সাজপোষাকেও বেশ সৌখীন হয়ে উঠেছেন, তখনও তাঁর হাতে থাকত একগাছা অত্যন্ত বেমানান, মোটাসোটা ও ভীতিকর লগুড়— যার আঘাতে অনায়াসেই গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে মানুষের বা বড় বড় পশুর মাথা। প্রথম বয়সে শরৎচন্দ্র যাপন করেছিলেন দস্তুরমত দুর্দান্ত জীবন। উত্তরকালে একান্তভাবে সাহিত্যসাধক হয়েও বোধ করি তিনি পূর্ববর্তী বয়োধর্মের প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ক'রে নিতে পারেন নি। কেউ কোনদিন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে লাঠালাঠি বা হাতাহাতি করতে দেখে নি বটে, কিন্তু তাঁর মনের ভিতরে নিশ্চয়ই আত্মগোপন ক'রে থাকত একটা উগ্র অংশ।

তবে আমাদের কাছে তিনি ধরা দিয়েছিলেন যথার্থ প্রেমিক মানুষের মত। প্রায়ই সাহিত্য ও ললিতকলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হ'ত এবং প্রায়ই আলোচনা গিয়ে দাঁড়াত বিষম তর্কাতর্কিতে। অধিকাংশ সময়েই আমরা চার বন্ধু— প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুধীর সরকার ও আমি— থাকতুম এক পক্ষে। প্রভাত ছিলেন তো একাই একশো, তর্কে তাঁর মুখ বন্ধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, তার উপরে আবার আমরা তিনজন এবং

আরো কেউ কেউ, শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে কোণঠাসা হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করতে হ'ত। তর্কের উত্তাপে আমরা সময়ে সময়ে অসংলগ্ন অপ্রিয় কথাও ব'লে ফেলেছি, কিন্তু কোনদিন তিনি মুখভার করেন নি, বরাবরই ক্ষমা করেছেন।

পূর্বে যে লেড়ী কুকুরের বাচ্চার কথা বলেছি, শরৎচন্দ্র তার নাম রেখেছিলেন "ভেলু"। তার সব চেয়ে বড় সখ ছিল, যে কোন মানুষকে আদর ক'রে কামড়ে দেওয়া। তার এই বিপদজনক সখের জন্যে শরৎচন্দ্রের নামে আদালতে নালিশ হয়েছে, তবু ভেলুর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না। একদিন সে তার মনিবেরই করতল কামড়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিয়েছিল। পরদিন ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে শরৎচন্দ্র এসে বললেন, 'আহা, আমাকে কামড়ে দিয়ে ভেলুর যে কি দুঃখ আর লজ্জা হয়েছিল, তার চোখ-মুখ দেখলেই তোমরা বেশ বুঝতে পারতে!' এই ভেলু ঘরে ঢুকলেই সুধীর সরকার হন্তদন্ত হয়ে প্রাণপণে একটি লাফ মেরে একেবারে টেবিলের উপরে আরোহণ করতেন এবং সেই সারমেয়-নন্দনকে সেখান থেকে অপসারিত না করা পর্যন্ত তিনি আর ভূমিষ্ঠ হবার নাম মুখেও আনতেন না।

ভেলুর জন্যে হোটেল থেকে আসত ঘিয়ে ভাজা মটন চপ ও কাটলেট প্রভৃতি। প্রেমাঙ্কুর একদিন শরৎচন্দ্রের অসাক্ষাতে অভিযোগ করলেন, 'শরৎবাবুর ব্যবহারটা দেখ একবার! একটা লেড়ী কুকুরের জন্যে আসছে ভালো ভালো খাবার, আর আমরা এতগুলো ভদ্রলোক যে এখানে উপস্থিত আছি, সেটা ওঁর খেয়ালেই আসে না!'

কেবল ভেলুর উপরেই শরৎচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব ছিল না, তিনি ভালোবাসতেন কুকুর জাতটাকেই। তাঁর মোটর-চালকের উপরে

নির্দেশ ছিল, 'দেখ বাপু, তুমি যদি কোন মানুষ চাপা দাও, তাহ'লে হয়তো আমি কিছু বলব না। কিন্তু তুমি যদি কোন কুকুরকে চাপা দাও, তাহ'লে তখনি তোমার চাকরিটি যাবে।'

এই ভেলু যখন মারা পড়ে তখন শরৎচন্দ্রের মুখ দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম। পুত্রশোকেও কোন মানুষের মুখ তেমন কাতর হয় না।

মনোমোহন থিয়েটার। চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্রের প্রথম বই "আঁধারে আলো" দেখানো হচ্ছে। একখানা বিছানা-পাতা 'বক্সে'র উপরে শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাতুড়ীর সঙ্গে ব'সে আছি আমি। ছবি দেখানো শেষ হ'ল। তারপর গাত্রোত্থান ক'রে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন, তাঁর তালতলার চটির এক পাটি অদৃশ্য হয়েছে। অনেক খোঁজাখুজির পরেও চটির পাটি আর পাওয়া গেল না। সকলেরই ধারণা হ'ল, নিশ্চয়ই কোন চোরের কীর্তি! শরৎচন্দ্র তখন একপাটি চটি জুতাই বগলদাবা ক'রে নগ্নপদে প্রস্থানোদ্যত হলেন।

আমি বললুম, 'দাদা, ঐ একপাটি চটি আপনার আর কোন্ কাজে লাগবে ? এইখানেই রেখে যান।'

তিনি বললেন, 'পাগল নাকি ? চোর ব্যাটা আড়ালে কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে ব'সে আছে। আমরা চ'লে গেলেই এই পাটিটাও নিয়ে যাবে।'

বললুম, 'কিন্তু একপাটি চটি নিয়ে আপনি কি করবেন ?'

—'শিবপুরে যাচ্ছি। গঙ্গা পার হবার সময়ে জলে ফেলে দিয়ে যাব।'

তিনি তাই-ই করেছিলেন। এদিকে পরদিন সকালেই থিয়েটারের চাকর 'বক্সে'র তলা থেকে হারানো জুতোর পাটি টেনে বার করলে। কিন্তু তখন শরৎচন্দ্রের অন্য পাটিটাকে

গঙ্গাগর্ভ থেকে উদ্ধার করবার আর কোন উপায়ই ছিল না।

শরৎচন্দ্র পানিত্রাশের পল্লীভবনে যাবার পর বহুকাল তাঁর দেখা পাই নি। ইতিমধ্যে আমিও গঙ্গার ধারে আমার নূতন বাড়ীতে চ'লে এসেছি। একদিন দুপুরবেলায় বারান্দায় ব'সে লিখছি কি পড়ছি মনে নেই, হঠাৎ শুনতে পেলুম একতালায় সিঁড়ির কাছে কে পরিচিত কণ্ঠস্বরে আমার মেয়েদের সঙ্গে কথা কইছেন। বলছেন, 'ওগো বাছারা, তোমরা যখন জন্মাওনি, তোমাদের বাবা তখন থেকেই আমার বন্ধু।' গাত্রোত্থান ক'রে মুখ বাড়িয়ে দেখি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছেন শরৎচন্দ্র ও স্বর্গীয় কবি গিরিজাকুমার বসু।

এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আমি অত্যন্ত বিস্মিত। উপরে এসে শরৎচন্দ্র বললেন, 'গিরিজার সঙ্গে বরানগরের বাগানে যাচ্ছিলুম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়াতে এখানে চ'লে এসেছি।'

তাঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললুম, 'কোথায় রবীন্দ্রনাথ আর কোথায় আমি! চাঁদের বদলে পাবেন আপনি জোনাকীকে। সিগারেট নিন্।'

—'না, সিগারেট আর ভালো লাগে না। তামাক আছে?'

—'না দাদা। তবে হুইস্কি আছে।'

—'না, তাও খাব না।'

—'তবে কি খাবেন?'

—'গল্প। খালি গল্প করব।'

তাই হ'ল। ঘণ্টাকয় ধ'রে চলল কেবল গল্প আর গল্প—পুরানো দিনের গল্প, আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের গল্প, পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গল্প। দেখলুম পুরাতন শরৎচন্দ্র

এতদিনেও একটুও পরিবর্তিত হন নি— অন্তত আমার কাছে।

অবশেষে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি চমৎকার জায়গায় বাড়ী করেছ। কলকাতায় থেকেও তুমি কলকাতায় নেই, চোখের সামনে সর্বদাই দেখছ গঙ্গার জীবন্ত জলের ধারা। এমন সৌভাগ্য হয় কম লোকেরই। আচ্ছা, এইবারে তোমার বাড়ীর ঘরগুলো দেখাও দেখি।'

তাঁকে তিনতলার, দোতলার ও একতলার প্রত্যেক ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলুম। তিনি যে বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো পরীক্ষা করছেন, এটা বুঝতে পারলুম।

তারপর তিনি যেন নিজের মনে মনেই বললেন, 'এ বড় অন্যায় তো!'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি অন্যায় দাদা ?'

তিনি বললেন, 'তোমার এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেদিন আমার কাছে অভিযোগ ক'রে এলেন, 'হেমেন্দ্রের ঘরে ঘরে টাঙানো অশ্লীল, নগ্ন মূর্তির ছবি। চোখ তুলে তাকানো যায় না।' কিন্তু আমি তোমার বাড়ীতে এসে একখানা অশ্লীল ছবিও তো দেখতে পাচ্ছি না! এ সব তো উঁচুদরের আর্ট, এ দেখে যার মনে অপবিত্র ভাব জাগে, তারই মন শ্লীল নয়।'

শরৎচন্দ্র যথার্থ শিল্পী, তাই তিনি এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শ্রেষ্ঠ আর্ট কোনদিনই অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেয় না। গ্রীক ভাস্কররা নগ্ন মূর্তি গড়তেন বটে, কিন্তু অশ্লীল মূর্তি গড়তেন না।

শরৎচন্দ্র আমার সেই বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম প্রকাশ করেন নি। কিন্তু পরে গিরিজাকুমারের মুখে তাঁর নাম আমি শুনেছিলুম। তিনি বাংলাদেশের একজন অতিপরিচিত কবি। এখন স্বর্গত।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যখন আমার মৌখিক আলাপ হয় নি এবং যখন আমি তাঁকে চোখেও দেখি নি, সেই সময়ে (২০শে মার্চ, ১৯১৪ খৃঃ) রেঙ্গুন থেকে একখানি পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন : 'আমার লেখার ওপরে আপনার অনুগ্রহ দেখে সত্যই বড় সুখী হয়েছি। অনেকেই অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু লেখা আমার নিতান্তই মামুলী ধরণের। বিশেষত্ব আর কি আছে ? তবে এটা ঠিক ক'রে রাখি যেন মনের সঙ্গে লেখার ঐক্য থাকে। যা ভাবি, তাই যেন লিখি। কে কি মনে করবে, ও কি বলবে, সেদিকে প্রায়ই তাকাই নে। বোধ করি এই জন্যেই লোকের মাঝে মাঝে ভালোও লাগে— কখনও বা লাগেও না, তবুও বড় একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে লেখককে অপমানিত করতে চায় না। * * * আমার বাংলা ভাষার ওপর মোটেই দখল নেই বললে চলে— শব্দসঞ্চয় খুব কম। কাজেই আমার লেখা সরল হয়— আমার পক্ষে শক্ত ক'রে লেখাই অসম্ভব। আমার মুর্খতাই আমার কাজে লেগেছে।'

যে সময়ে শরৎচন্দ্র এই পত্রখানি লিখেছিলেন, তখন তিনি আবার বহুকাল অজ্ঞাতবাসের পর নূতন ক'রে সাহিত্য-সাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন। খ্যাতির প্রথম ধাপে পদার্পণ করেছেন মাত্র। কিন্তু তখনও এমন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি যে, তাঁর উপর নির্ভর ক'রে একশো টাকা মাহিনার চাকরিটি ছেড়ে দিতে পারেন। অভাবিত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তখনও তাঁর ধারণার মধ্যে ধরা দেয় নি। কিন্তু সেই সময়েই তাঁর মনের গড়নটি লক্ষ্য

করবার বিষয়। তাঁর মত ছিল— 'যা ভাবি, তাই যেন লিখি।' সে লেখা প'ড়ে যে কেউ তুষ্টও হ'তে পারে, রুষ্টও হ'তে পারে, তা নিয়ে ছিল না তাঁর কিছুমাত্র মাথাব্যথা। তিনি আমরণ ছিলেন এইরকম নির্ভীক মনের অধিকারী।

কিন্তু তিনি ছিলেন অভিমানী। "চরিত্রহীনে"র বিরুদ্ধে চারিদিকে যখন নিন্দার ঝড় উঠেছে, তখনও তিনি অটল ছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত ধুরন্ধর সাহিত্যিক যখন "চরিত্রহীনে"র পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যান করেন, তখন মনে মনে তিনি অল্প আহত হন নি। অথচ একখানি পত্রে তিনি নিজেই "চরিত্রহীন"কে বলেছেন 'বখাটে উপন্যাস।'

তাঁর অভিমানের আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। বোধ করি প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ছাত্রসভায় বক্তৃতা দিতে উঠে বঙ্কিম-চন্দ্রকে তিনি 'সেকেলে বঙ্কিম' ব'লে উপহাস করেছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের অপরাধ, তিনি নাকি মামুলী প্রথায় পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় দেখাবার জন্যেই গোবিন্দলালকে দিয়ে রোহিণীকে হত্যা করিয়েছেন প্রভৃতি। একখানি পত্রিকায় আমি তাঁর এই উক্তির প্রতিবাদ করি এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাই, শরৎচন্দ্রের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশী সেকেলে নন, কারণ শরৎচন্দ্রও একাধিক উপন্যাসে পাপের পরাজয় দেখাতে ছাড়েন নি এবং তাঁর কোন কোন নায়িকা পাপের জন্যে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন দণ্ড ভোগ করেছে। শরৎচন্দ্র আমার প্রতিবাদের জবাব দিলেন না বটে, কিন্তু এত বেশী রেগে গেলেন যে, প্রায় এক বৎসর ধ'রে আমার সঙ্গে দেখা হ'লেও ভালো ক'রে কথা কইতেন না। কিন্তু তিনি বেশী দিন মনের ভিতরে কারুর বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখতে পারতেন না। তাই আবার আমাদের মনের মিলনে বাধা হয় নি।

শরৎচন্দ্রের দুই তিনটি ছোটগল্প বাজার সরগরম ক'রে তুলতেই প্রত্যেক পত্রিকার সম্পাদকই তাঁকে লেখকরূপে লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে নূতন রচনা না পেয়ে সকলে এখানে-ওখানে খোঁজ নিতে লাগলেন, তাঁর কোন পুরানো লেখা পাওয়া যায় কিনা? একাধিক পুরাতন রচনার সন্ধান পাওয়া গেল এবং সেগুলি একে একে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে লাগল। তাঁর অজ্ঞাতসারেই।

শরৎচন্দ্রের একাধিক পত্র পাঠ করলেই বেশ বোঝা যায়, এ জন্যে তিনি কম বিরক্ত হন নি। তাঁর দুই একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করছি: 'আমার ছেলেবেলার ছাইপাঁশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্ছে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্ছে তা আমি লিখে জানাতে পারি নে। সমাজপতি (সুরেশচন্দ্র) সমজদার লোক হয়ে, কেমন ক'রে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য!'

তাঁকে না জানিয়েই "ভারতী"তে বেনামে যখন "বড়দিদি" প্রকাশিত হয়, তখন কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচনা। কিন্তু "বড়দিদি" সম্বন্ধে শরৎ-চন্দ্রের নিজের ধারণা অতটা উচ্চ ছিল না। তাঁর মতে ঐ রচনাটি 'মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।'

শরৎচন্দ্রের ধারণা ভ্রান্ত নয়। তাঁর রচনার জনপ্রিয়তা দেখে সম্পাদকেরা হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন— এমন কি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মত উচ্চশ্রেণীর সম্পাদকও। তাই শরৎ-চন্দ্রের নূতন রচনা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা তাঁর প্রথম বয়সের অপরিপক্ক রচনাবলী নিয়েই কাড়াকাড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এদের কতকগুলি আখ্যানবস্তু চলনসই

হ'লেও রচনাভঙ্গীর উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান এবং কতকগুলি লেখা এমনিই অকিঞ্চিৎকর যে প্রকাশ ক'রে লেখককে অপমান ছাড়া আর কিছুই করা হয় নি।

আত্মশক্তির উপরে শরৎচন্দ্রের একটা অন্ধ নির্ভরতা ছিল এবং সময়ে সময়ে সেটা তিনি যুক্তিহীন শিশুর মতই সরলভাবে প্রকাশ ক'রে ফেলতেন। একদিনের কথা বলি। "যমুনা" তখন উঠে গেছে এবং সেই ঘরেই বসে সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকা "মর্মবাণী"র আসর। শরৎচন্দ্র তখন পূর্ণচন্দ্রের মত সম্পূর্ণরূপেই সমুদিত।

আমরা কয় বন্ধু মিলে ব'সে ব'সে গল্প করছি। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" তখন "সবুজপত্রে" ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে আরম্ভ হয়েছে ঘোরতর আন্দোলন। প্রসঙ্গক্রমে "ঘরে-বাইরে"র কথা উঠল। শরৎচন্দ্র বললেন, 'রবিবাবু "সবুজপত্রে" "ঘরে-বাইরে" লিখছেন। এবারে "ভারতবর্ষে" আমার যে উপন্যাস বেরুবে, তোমরা নিক্তি ধ'রে দেখে নিও, তার ওজন "ঘরে-বাইরে"র চেয়ে এক তিল কম হবে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনার লেখা শেষ হয়ে গেছে?'

তিনি বললেন, 'না, এখনো লেখা আরম্ভই হয় নি।'

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। কিন্তু সেখানে ছিলেন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। কারুর যুক্তিহীন কথাই তিনি চুপ ক'রে শোনবার ছেলে নন। বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এখনো শেষ হয় নি, আর আপনার উপন্যাস এখনো লেখাই হয় নি! যা এখনো লেখেন নি, তার সঙ্গে কি ক'রে "ঘরে-বাইরে"র তুলনা করছেন?'

তবু শরৎচন্দ্র বললেন, 'দেখে নিও।'

যতদূর মনে পড়ে, শরৎচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাসের নাম

"গৃহদাহ", তার একটি চরিত্রের উপরে রবীন্দ্রনাথের অন্য একখানি উপন্যাসের একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট ছায়া আছে।

এই উপন্যাস সম্বন্ধেই কি একখানি পত্রে শরৎচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছিলেন? 'এ গল্পটা 'গোরার' (রবীন্দ্রনাথের) 'পরেশবাবুর' ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ'। তবে ধরবার যো নেই।' আমার সন্দেহ সত্য হ'লে বলতে হবে, উপন্যাস লিখতে আরম্ভ ক'রে শরৎচন্দ্র নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি "ঘরে-বাইরে"র সমকক্ষ কোন কিছু রচনা করছেন না। আর সত্য কথা বলতে কি, "গৃহদাহ" কেবল "ঘরে-বাইরে"র সঙ্গে তুলনীয় তো নয়ই, ঐ উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যের মধ্যেও উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে নেই।

গোড়া থেকেই দেখে এসেছি, শরৎচন্দ্রের মধ্যে ছিল না কোন রকম 'পোজ' বা ঢং। যখন সর্বত্রই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিকরূপে স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়েছেন, তখনও তিনি নিজেকে অভিজাত বা হোমরাচোমরাদের একজন ব'লে পরিচিত করবার কোন চেষ্টাই করতেন না। এবং কতদিনই তাঁর মুখে এই সব কথা শুনেছি—'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল গল্প কাকে বলে হেমেন্দ্র? ও বস্তুটি তো আমি জানি না! অভিজাত সাহিত্যিক বলে কাদের? যাঁরা লোককে ধাপ্পা দিয়ে, ধাক্কা মেরে চমকে দেন? আমি বাপু, বেশী লেখাপড়াও করি নি, আমার জ্ঞানও খুব বেশী নয়। তবু যে লোকে আমার লেখা পড়তে চায়, তার কারণ হচ্ছে আমি নিজের চোখে যা দেখি, আর নিজের মনে যা অনুভব করি, লেখার ভিতর দিয়ে কেবল সেইটুকু প্রকাশ করতে চাই।'

কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে মুখের কথা মিলত না মাঝে

মাঝে। একদিন আমাকে তিনি বললেন, 'সাহিত্যে দুরাত্মার ছবি আঁকা উচিত নয়। পৃথিবীতে দুরাত্মা আছে তো অসংখ্য, তাদের আবার সাহিত্যক্ষেত্রে টেনে আনা কেন?'

আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, তিনি নিজেই দুরাত্মার ছবি এঁকেছেন। তিনি আর কিছু বললেন না।

আর একদিন আমাকে বললেন, 'হেমেন্দ্র, কখনও অনুবাদ কোরো না, ওটা হচ্ছে পণ্ডশ্রম।'

আমি বললুম, 'আমার পক্ষে হয় তো ওটা খানিকটা পণ্ডশ্রমই বটে, কিন্তু অনুবাদের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। অনুবাদের সাহায্যে যে কোন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা যায়।'

তবু তিনি বললেন, 'না, অনুবাদ করা আমি পছন্দ করি না।'

শেষের দিকে শরৎচন্দ্রের মত বদলেছিল বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনিও অনুবাদ করতে ছাড়েন নি। তাঁর দ্বারা দু'খানি ইংরেজী উপন্যাস অনূদিত হয়েছিল। "ইষ্টলিন" অবলম্বনে "অভিমান" এবং "মাইটি অ্যাটম" অবলম্বনে "পাষাণ"। এই দুটি রচনার পাণ্ডুলিপি এখন কার কাছে আছে তা জানি না, কিন্তু প্রকাশ করলে নিশ্চয়ই কৌতূহলী পাঠকের অভাব হবে না।

শরৎচন্দ্রের লেখা সহজ, সরল এবং পড়বার সময়ে মনে হয় যেন তা স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু আমি একাধিকবার রচনায় নিযুক্ত শরৎচন্দ্রকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তিনি অনায়াসে তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন না। একবার ধীরে ধীরে লিখতেন, আবার জায়গায় জায়গায় লেখা কাটতেন, আবার কলম থামিয়ে চুপ ক'রে ভাবতেন, সে সময়ে বোধ হ'ত মনে মনে তিনি যেন কষ্টভোগ করছেন। তাঁর লেখার আরো কিছু কিছু বিশেষত্ব ছিল। তিনি খুব দামী ও ভালো কাগজ ব্যবহার করতেন।

যখন বাঙালী লেখকদের মধ্যে ফাউনটেন পেনের বিশেষ চলন হয় নি, তখনও তিনি ফাউনটেন পেন ছাড়া আর কোনরকম কলম নিয়ে কাজ করতেন না। তাঁর লেখার ছাঁদ ছিল ছোট ছোট, কিন্তু বড় সুন্দর। ঠিক যেন মুক্তার সারি।

নানা সাহিত্য-বৈঠকে ও অন্যান্য স্থানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে যে কতবার, তা গণনা ক'রে বলা অসম্ভব। আমার বাড়ীতে দয়া ক'রে বার বার তিনি এসেছেনও। কিন্তু শিবপুরে বা পানিত্রাশে তাঁর কোন বাড়ীতে কোন দিনই আমার যাওয়া হয়ে ওঠে নি। তাঁর বালীগঞ্জের বাড়ীতেও আমি গিয়েছিলুম একবার মাত্র। আমি তখন কোন্ পত্রিকার সম্পাদক, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। একটি রচনা ভিক্ষা করবার জন্যে একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে ধর্না দিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, তিনি আগে ছিলেন উদীয়মান সাহিত্যিক, এখন হয়েছেন চলচ্চিত্র-পরিচালক।

শরৎচন্দ্র আমাদের দেখে খুসি হলেন, দু'জনকে নিয়ে গিয়ে বসলেন একতলার একখানি প্রশস্ত ঘরে। অল্পক্ষণ কথাবার্তার পর আমাদের আগমনের কারণ বললুম।

তিনি দুঃখিতভাবে বললেন, 'আমি আর লেখা দিতে পারব না, আমি আর লিখতে পারি না। মাথায় বিষম যন্ত্রণা, কলম ধরা অসম্ভব।'

আমি আর পীড়াপীড়ি করলুম না, ওটা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। অন্য কথা পাড়লুম।

খানিকক্ষণ গল্প করবার পর শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চল হেমেন্দ্র, তোমাকে আমার বাড়ীর ভিতরটা দেখিয়ে আনি।'

আমাকে নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর বাড়ীর একতলার ও দোতলার

কয়েকখানি ঘর দেখালেন। তাঁর লেখবার ঘরটিও দেখলুম। ছোট ঘর। বিশেষ কোন আসবাব বা সাজসজ্জা নেই। ছোট একটি টেবিলের উপরে বৈদ্যুতিক আলোদান এবং এলোমেলোভাবে ছড়ানো এটা ওটা সেটা। একদিকে একটি ছোট পুস্তকাধার, তার তাকে সাজানো কতকগুলি ইংরেজী পুস্তক। সাহিত্যিকের ঘর ব'লে মনে হ'ল না।

শরৎচন্দ্র বললেন, 'কত লোকই দেখা করতে আসেন, কিন্তু তুমি আসো না কেন? তোমার মত পুরানো বন্ধুর মুখ দেখলে আমার মনে আনন্দ হয়।'

বললুম, 'এই তো আজ এসেছি দাদা!'

—'হ্যাঁ, দায়ে প'ড়ে।'

হেসে বললুম, 'কিন্তু সে দায় থেকেও তো আপনি আমাকে উদ্ধার করলেন না!'

করুণ চোখে আমার দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'বিশ্বাস কর হেমেন্দ্র, আমি আর লিখতে পারি না। তুমি আমার শরীরের অবস্থা জানো না, লেখা আমার আসে না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে কাতরতা।

সেদিনও আমি সন্দেহ করতে পারি নি, মৃত্যু তাঁর কত কাছে এগিয়ে এসেছে! তারপর সত্য সত্যই তিনি আর কোন নূতন রচনায় হাত দেন নি।

তার কিছুদিন পরে বেতার প্রতিষ্ঠানে শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে একটি অনুষ্ঠান হয়। সেখানে নাটোরের মহারাজা প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তার পর বক্তা উঠে চিরাচরিত নিয়মে শরৎচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করে দু'-চার কথা বললেন। ভালো লাগল না।

আমি উঠে বললুম, 'আমি মানুষ শরৎচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি না। আমি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।' আর কি বলেছিলুম মনে পড়ে না।

আমার কথা শরৎচন্দ্রের খুব ভালো লেগেছিল এবং তাই উপলক্ষ্য ক'রে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শুনেছি, বেতারের কর্ত্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাটি 'রেকর্ডে' ধ'রে রেখেছেন।

সেই শরৎচন্দ্রের শেষ জন্মোৎসব, সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

———:০:———